বিজ্ঞান

চিত্রে ও গল্পে।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র,

ব, এস, সি, (গ্লাস্‌গো) ; এম্, আর, স্যান, আই (লণ্ডন) প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ।

[মূল্য ১৲

প্রকাশক—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার,

বাণী সাহিত্য মন্দির

১৯৯সি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

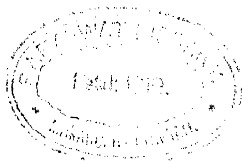
প্রিণ্টার—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

সুধা প্রেস

৯ নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার



ভূমিকা।

বিজ্ঞানের মত একটা গুরু বিষয় গল্পের ভাষায় লেখার জন্য অনেকে আমার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিবেন বলিয়া ভূমিকা লিখিতেছি—না হইলে ভূমিকা লিখিবার কোন দরকার ছিল না।

শিশুদিগের জন্য উপযুক্ত পুস্তকের অভাব অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। সকল অভিভাবকই চাহেন শিশুরা বাল্যকাল হইতে Liberal education পায়। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ঠাকুরমার গল্প প্রভৃতিও যেমন তাহাদের পাঠ করা উচিত, কিছু ইতিহাস, কিছু বিজ্ঞান, কিছু ভূগোলের সহিত পরিচয়ও হওয়া তেমনি আবশ্যক মনে করি। ভূত পরীর গল্প পড়িয়া কল্পনাকে যে উদ্দাম শক্তি দেওয়া হয়, তাহাকে বাঁধনের মধ্যে আনিতে হইলে কিছু নিছক সত্য ইতিহাস তাহাদিগকে শুনাইতে হইবে—

অন্যথা ত আমরা বলিতে পারিনা আমাদের দায়ীত্বের অপ-ব্যবহার আমরা করি নাই, তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বাজারে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, দেশের শ্রেষ্ঠ বক্তিগণের জীবনী, ভূত পরীর গল্প—এসব পাওয়া যায়, এবং শিশুসাহিত্য হিসাবে সেগুলি অত্যন্ত আবশ্যকায় সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্ব-সভ্যতায় বিজ্ঞানের যে কত বড় একটা স্থান আছে; তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া না দিলে, বিজ্ঞানকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলে সে বাল্যকাল হইতে শিশুদিগের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

শিশু, বৃদ্ধ, সকলের কাছেই লঘুসাহিত্য যেমন আদরনীয় হইয়া থাকে, নীরস জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি সেরূপ হয় না। শিশুদের স্বভাবই এই, তাহারা মজা চাহে—মজার কথা শুনিতে ভালবাসে। সুতরাং চাবুক না দেখাইয়া, পাঠ্য পুস্তকের ভীতি উৎপাদন না করিয়া, শুধু গল্পের মধ্য হইতে যদি কিছু সারবান্

কথা ছেলেমেয়েদের শুনাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই গল্পের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

শিশুদিগের এই সকল অভাবের দিকে চাহিয়াই আমি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছি। যাহাতে ঠাকুরমার গল্প ফেলিয়া এই সকল সত্য গল্প শুনিতে তাহাদের আগ্রহ হয়, পুস্তক লিখিবার সময় তাহাই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মোটা কথাগুলি সরল ভাষায় বুঝাইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যাহাদের জন্য ইহা লিখিয়াছি সেই বালক বালিকাদের কথা মনে করিয়া আমি সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছি। যেখানে সম্ভব হইয়াছে গল্পের মধ্যে মোটামুটি **Principle** গুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি; যে সব জায়গায় তাহা নীরস হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াছি, সে সব জায়গা একেবারে বাদ দিয়াছি।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি সুখপাঠ্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমিও সেই চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ঠাকুরমার গল্পগুলি যেরূপ সাদরে শিশুরাজ্যে স্থান পাইয়াছে, এ গল্পগুলিও সেইরূপ

স্থান পাইলে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু না শিখিলেও— তাহা জানিবার জন্য শিশুদের একটা আগ্রহ হইলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

গ্রন্থকার।



দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"বিজ্ঞানের" প্রথম সংস্করণের সাফল্যের জন্য বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি!

বাংলাভাষায় এই প্রকার বই লেখার বিঘ্ন অনেক। একে তো যথোপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাতে আবার যথোপযুক্ত Appreciationএর অভাবে পরিশ্রমের মজুরী পোষায় না। সে সব সত্ত্বেও যে বইখানিকে এ ভাবে বাহির করিতে পারিয়াছিলাম, সে কেবল প্রকাশক মহাশয় লাভ লোক্‌সান না খতাইয়া অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া—আজ তাঁহার অর্থব্যয় এবং আমার চেষ্টা সকলই সার্থক মনে হইতেছে। আশা করি শিক্ষিত সমাজের এ শুভদৃষ্টি হইতে ভবিষ্যতে "বিজ্ঞান" বঞ্চিত হইবে না।

এই সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন কিছুই করি

নাই। স্থানে স্থানে কয়েকটী কথা বদলাইয়াছি মাত্র। এক্স্-রে সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল একটু বেশী লক্ষ্য করিয়া, এক্স্-রের বিষয় আর একটু বিশদ ভাবে লিখিয়াছি এবং তৎসম্পর্কীয় একখানি নূতন ছবিও দিয়াছি।

বলা বাহুল্য, পুস্তকের আকার কিছু বাড়িলেও মূল্য বাড়িল না।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

আবিষ্কারের গল্প

বিজ্ঞানের দান

বিষয়   পৃষ্ঠা

বিজ্ঞান

চিত্রে ও গল্পে।



জুয়াচোরের শাস্তি।

ছেলেবেলায় আমরা একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু গল্পটী আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল—তাই সেই গল্পটী বলিয়াই আমাদের বক্তব্য আরম্ভ করিব।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন মোটর গাড়ীর নাম কেহ শুনে নাই, রেলগাড়ী কেহ দেখে নাই। টেলিগ্রাফ ত দূরের কথা, ডাকের ব্যবস্থাও কিছু ছিল না। তখন বন্দুক-কামানের হাঙ্গামা ছিল না; তীর ধনুক দ্বারা লোকে বীরত্ব দেখাইত। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়া কেহ আলো

জ্বালিত না ; পাথরের উপর লোহা জোরে ঘসিয়া আগুন প্রস্তুত করিত।

যে দেশের কথা বলিতেছি, সেটা অবশ্য আমাদেরই দেশ। কিন্তু তখন সহর দুই-একটী বৈ ছিল না ; আর কলিকাতার মতন এমন সহর ত ছিলই না। যেটা ছিল রাজধানী, সেখানে কত লোক ছিল জান ? কলিকাতার এক পাড়ায় এখন যত লোক, তত লোকও নয়। তবে রাজ-বাড়ী যা ছিল, তেমন আর এখন দেখা যায় না। মস্ত বড় বাড়ী, তার এক পাশে রান্নার মহল, খাবার মহল, হাতিশালা, ঘোড়াশালা, চিড়িয়াখানা ; আর একদিকে ছিল দপ্তরখানা, দরবার ঘর, অস্ত্রাগার ও কোষাগার।

রাজা সভা করিয়া বসিয়া আছেন। সেখানে বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন, সেনাপতি ছিলেন, পারিষদবর্গ ছিলেন এবং ছিলেন পণ্ডিতেরা। এমন সময়ে প্রহরী-মহলে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লোকের কলরব নিকটে আসিতে লাগিল। সকলেই দরজার দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমে দেখা গেল যে,

নগরপাল একজন লোককে বাঁধিয়া লইয়া আসি-তেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি—এই লোকটীকে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছ কেন? এরা চায় কি?" তখন নগরপাল জোড় হস্তে বলিল—"মহারাজ, এই ব্যক্তি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। সহরে এ একজন বার্দ্ধিষ্ণু দোকানদার। এর দোকানে সমস্ত প্রকার জিনিসই পাওয়া যায়। লোকটার অবস্থাও মন্দ নয়। কিন্তু নিজের অবস্থায় এ লোকটা সুখী নয়। এখন পরকে ঠকাইতে পারিলে ছাড়ে না। এই বালককে আজ এই লোকটা ঠকাই-য়াছে।" এই বলিয়া একটী বার বৎসরের গৌর-কান্তি বালককে দেখাইয়া দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বালককে দেখিলেই যে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে—ইহাকেও এই লোকটী ঠকাইল?" নগরপাল বলিল, "একটী বাটি দিয়া কাল সকালে এই বালকের মা ইহাকে দোকানে এক সের গুড় কিনিতে পাঠাইয়াছিল; ইহার বাটিটার

ভিতর একটী দাগ দেখাইয়া মা বলিয়া দেন যে, এই দাগ পর্য্যন্ত গুড় হইলেই তাহার ওজন এক সের হইবে। বালক দোকানে গিয়া গুড় লইয়া আসে, দোকানী ওজন করিয়া গুড় দিয়াছিল এবং বালকও দেখিয়াছিল যে বাটির ভিতরে সেই দাগ পর্য্যন্তই গুড় দেওয়া হইল। বালক তখন ফিরিয়া গিয়া তাহার মাকে গুড় দেয়। আজ সে আবার ইহার দোকানে এক সের তেল কিনিতে আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সেই বাটিটাই ছিল! দোকানী বালককে বলে, 'তোমাকে তেল দিতেছি কিন্তু তাহা ওজন করিবার আর দরকার হইবে না। তোমার বাটিতে ত দাগই আছে।" বালক সেই দাগ পর্য্যন্ত তেল লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। মা কিন্তু তেল দেখিয়াই বালককে বলিল, "তুই কি এক সের তেল আনিস্ নাই?—না, খানিকটা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিস্?' বালক বলিল—"আমি ত এক সের তেলই আনিয়াছি এবং রাস্তায়ও ত কিছু পড়েনি, এই দেখ না তোমার কালকের দাগ

পর্য্যন্তই তেল আছে।" মা তখন বলিল, "ও দাগ দেখিয়া আমি কি করিব, ও তো এক সের গুড়ের দাগ; তেল তো ওর চাইতে আরও বেশী হবে।" বালক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; মা বলিল, 'সব জিনিসের মধ্যেই ভারী হাল্কা আছে। এক বাটি তেল ও এক বাটি গুড় সমান ওজনের হয় না। তেলটা গুড়ের চেয়ে হাল্কা, তাই সেটা সমান ওজনের গুড়ের চেয়ে বেশী জায়গা নিয়ে থাকে। এক বাটি জলের ওজন আবার আর এক রকম।' বালক কিন্তু ঠিক বুঝিল না। তখন মা ওজন করিয়া এই সব দেখাইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বেশ, তুই এখনি এক মাপের একটী লোহার, একটী কাঠের, একটী সীসার, একটী পাথরের, একটী মাটির ও একটী পিতলের মার্ব্বেল কিনিয়া লইয়া আয়—তা হাতে করিলেই দেখবি, যে সীসাটা সব চেয়ে ভারী আর মাটির মার্ব্বেলটা সব চেয়ে হাল্কা। অন্য সবগুলিও এক রকমের নয়।' বালক তাই করিল এবং বুঝিতে পারিল যে দোকানী

সত্য সত্যই ঠকাইয়াছে ; তখন সে আমার কাছে আসিয়া খবর দেয়।" রাজা তখন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা কি সত্য ?" দোকানী কিন্তু বড়ই ধূর্ত্ত। সে বলিল, "মহারাজ, আমি যে দাগ পর্য্যন্ত তেল দিয়াছিলাম তা সত্য, কিন্তু আমি অতি মূর্খ, তাই এক আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসে যে ভিন্ন ভিন্ন ওজন হয়, তা আমি জানিতাম না।" রাজা বলিলেন "বটে, তুমি তা জান না! তা তোমাকে যদি এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিই, তাহা হইলে আমার রাজ্যের অনেককেই তুমি ফতুর করিবে।" এই কথা বলিয়া রাজা নগর-পালকে বলিলেন,—"আচ্ছা এক কাজ কর। ঐ যে-পিপেটা আছে, সেটা উহার স্কন্ধে চাপাইয়া দাও; তারপর উহার দোকান হইতে খানিক তুলা লইয়া পিপেটা ভর্ত্তি করিয়া দাও এবং সেই তুলার পিপে ঘাড়ে করিয়া দোকান হইতে যেন রাজবাড়ী আইসে।" লোকটাকে তাই করিতে হইল। তখন রাজা বলিলেন, "বেশ, ও তুলোগুলো বাহির করিয়া

উহাতে তেল ভরিয়া দাও, ও লোকটা আবার হাঁটুক।” যখন লোকটা পুনরায় রাজার কাছে আসিল, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বাপু সমান আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এক ওজনের হয়, কি ভিন্ন ওজনের হয় ?”

লোকটা তখন হাঁপাইতেছিল ; সে চীৎকার করিয়া বলিল, “দোহাই মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন। আমি বেশ বুঝিয়াছি যে এক আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের ওজন ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমি আর কাহাকেও ঠকাইব না।” মহারাজ তখন বলিলেন, “তা ত হইবে না, তোমাকে আরও একটু বুঝিতে হইবে, ইহার দোকানে যত ছোট ছোট পেরেক আছে, সব দাও ঐ পিপায় ভর্ত্তি করিয়া।” লোকটা চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু রাজার লোকজন কোন কথা শুনিল না—খালি পিপা লোহায় ভর্ত্তি করিতে লাগিল ; যখন পিপা অর্দ্ধেক ভর্ত্তি হইয়াছে, তখন লোকটা শুইয়া পড়িল এবং ক্ষীণ স্বরে বলিল —“আর পারি না।” কিন্তু পিপে ভর্ত্তি হইতে

লাগিল। যখন পিপে সম্পূর্ণ ভর্ত্তি হইল, তখন লোকটার আর কথা বলিবার শক্তি নাই। রাজা হুকুম দিলেন, "ওকে এক ঘণ্টা ঐ রকম করে রেখে ছেড়ে দিও।" আর দোকানীকে বলিলেন, "তুমি যাতে কাহাকেও ঠকাইতে না পার, সেই জন্য ঘি, তেল, নুন, গুড়, ময়দা, চাল প্রভৃতি সব জিনিসের এক সের, করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাপের এক একটী পিতলের বাটি প্রস্তুত করাইয়া দোকানের সম্মুখে রাখিয়া দিও। যাহার যেমন ইচ্ছা ওজনে বা বাটির দাগে জিনিষ লইতে পারিবে।"

সোণার মুকুট।

পূর্ব্ব গল্পে যে সময়ের কথা বলিয়াছি, সে সময়ের অনেক আগে, ঠিক এই রকমেরই আর একটী মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। আর সেই ঘটনা হইতে বিজ্ঞান-জগতের একটী বৃহৎ তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

সে অনেক দিনের কথা—দুই হাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে। সেই আদিম যুগে সিসিলী প্রদেশে সাইর্‌াকিউস্ নামে একটা নগর ছিল। সেই নগরের রাজার নাম—হিয়ারো।

রাজা হিয়ারো সেদিন এক বিরাট সভা করিয়া বসিয়াছেন। রাজার সভা,—পোষাক পরিচ্ছদ, জাঁক জমক, লোক লস্করে-সভা যেন গম্ গম্ করিতেছে। সকলের মুখেই হাসি। রাজার কিন্তু এততেও তৃপ্তি নাই—তাঁহার খেয়াল হইল—এমন একটা মুকুট তাঁহার চাই, যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য

আবিষ্কারের গল্প।

কোন রাজা চোখেও দেখে নাই! স্বর্ণকার-মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, কিন্তু ফরমাইস্ শুনিয়া তাহাদের সাহসেও কুলাইল না—কি করে? পৃথিবীর মধ্যে সবার সেরা মুকুট করা ত সহজ কথা নহে! অনেক দিন যায়, কত সেকরা হাসি মুখে আসে, আর মুখ ভার করিয়া চলিয়া যায়—মুকুট আর হয় না। রাজা ত একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিলেন! এমন সময়ে রাজার সম্মুখে হাজির হইল, একজন বিখ্যাত স্বর্ণকার।

সভাসদেরা এক বাক্যে স্বীকার করিল—হাঁ সাহসী বটে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত সোণা দরকার?"

স্বর্ণকার ভাবিয়া চিন্তিয়া ওজন বলিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিনে মুকুটটি দিতে পারিবে?"

স্বর্ণকার উত্তর করিল—"এক সপ্তাহ পরে।"

রাজা হুকুম দিলেন। সেকরা নির্দ্দিষ্ট-মত পরিমাণের সোণা লইয়া চলিয়া গেল।

আবার এক সপ্তাহ পরে রাজ-সভা বসিয়াছে। রাজা প্রথমেই ডাকিলেন সেই স্বর্ণকারকে। ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে স্বর্ণকার অভিবাদন করিয়া স্বর্ণ মুকুটটি রাজার সম্মুখে রাখিল। সভাশুদ্ধ লোক স্তব্ধ—তাহাদের সকলের দৃষ্টি আসিয়া পড়িল—সেই মুকুটটির উপর।

মুকুটটির কারু-কার্য্যে সভা একেবারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে আলোকে সভাসদগণের দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য ঝলসাইয়া গেল। রাজা হৃষ্ট-চিত্তে স্বর্ণকারকে পারিতোষিক প্রদান করিতে উঠিলেন—সভাসদ্গণের বাহবা ধ্বনিতে রাজার স্বর আর শোনা গেল না।

রাজা মুকুটটির শিল্প-চাতুর্য্যে প্রীত হইলেও তাঁহার কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল যে উহা খাঁটি সোণারই হইয়াছে কি না? কিরূপে জানা যায়! এত সুন্দর—একটা সোণার মুকুট—পৃথিবীতে যাহার জোড়া নাই—তাহাতে খাদ নাই ত?

আবিষ্কারের গল্প।

সভাসদ্‌গণকে বসিলেন—"পরীক্ষা করিতে পার ?"

সকলেই নীরব।

একজন প্রস্তাব করিল—আগুনে পোড়ান হউক। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। এমন জিনিসটা গলাইয়া নষ্ট করা হইবে ?—তাহা হয় না।

অন্য উপায় ?

সভাসদগণ নিরুত্তর।

সেই রাজ-সভার এক কোণে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস বসিয়াছিলেন। এত আলোচনার মধ্যে আর্কিমিডিস্ একেবারেই নীরব।

সহসা তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল;—চাহিয়া দেখিলেন, রাজা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

লজ্জায় আর্কিমিডিসের মাথা নত হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "আমাকে কিছুদিন সময় দিন—ইহার ভিতর আমি এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিব।"

* * *

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আর্কিমিডিস্

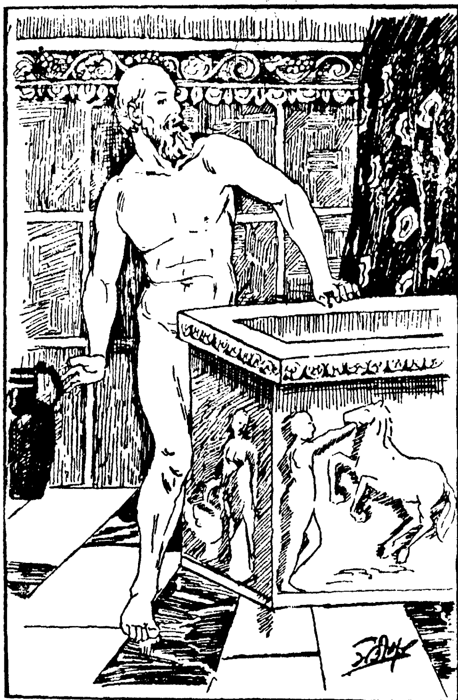
স্নান-কক্ষে টবে নামিতে যাইবেন। টবটি পরিপূর্ণ ছিল, যেমন পা ডুবাইলেন, ছলাৎ করিয়া জল উপছাইয়া পড়িল। যখন সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইলেন, তখন আরও খানিকটা জল পড়িয়া গেল।

বৈজ্ঞানিকের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই কয়দিন যে চিন্তায় তিনি তন্ময় হইয়াছিলেন, আজ যেন তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। আর্কিমিডিসের তখন আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। বস্ত্রত্যাগ করিয়া টবে নামিয়াছিলেন, সে কথা আর মনে হইল না— যেমন ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ছুটিতে লাগিলেন। মুখে কেবল—'পাইয়াছি,' 'পাইয়াছি'—রাস্তার লোকে যে দেখিল—ভাবিল, বুড়া ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

আর্কিমিডিস্ আর থামেন না—বরাবর রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। সভাসদেরা সকলেই অবাক্! কিন্তু রাজা জ্ঞানী আর্কিমিডিসকে চিনিতেন, তিনি তখন একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্কিমিডিস্ তুমি কি পাইয়াছ?" আর্কিমিডিস্ উত্তর করিলেন, "আজ আমি আপনার

আবিষ্কারের গল্প।

মুকুট খাঁটী সোনার কিনা বলিব বলিয়াছিলাম, এতদিন আমার আর কোনও চিন্তা ছিল না—এতদিন পরে আমি এখন মুকুট পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত।" এই বলিয়া তিনি একটী গামলা জলে পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "গামলাতে আর একটু জলও ধরে না, এখন ঐ মুকুটটী গামলার জলে ফেলিলে—খানিকটা জল উপছিয়া পড়িবেই এবং ঐ জলের আয়তন মুকুটে যতটা ধাতু আছে তার আয়তনের সমান হইবেই।" রাজা বলিলেন, 'তা কেন?" তখন আর্কিমিডিস্ বলিলেন, "তা নয়ই বা কেন? যে গামলায় এখন মুকুটটা আছে সেখানে একটু পূর্ব্বে জল ছিল মুকুটটী যেন জল-টুকু সরাইয়া দিয়াই নিজে তার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।" রাজা বলিলেন, "মুকুটের সমান আয়তনের জল পড়িলেই বা কি প্রকারে বুঝিব যে মুকুট সোণার কিনা!" তিনি উত্তর করিলেন, "মুকুট যদি সোণার হয় তাহা হইলে মুকুটের সমান ওজনের খাঁটি সোণা লইলেও ঐ একই



—যেমন ছিলেন সেই অবস্থাতেই ছুটিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে—পৃঃ ১৩।

মাপের জল উপছিয়া পড়িবে। কিন্তু তাতে যদি রূপা তামা কিম্বা আর কোনও ধাতু মিশ্রিত থাকে, তবে সমান ওজন হইলেও মুকুটের ধাতু বেশী জায়গা নিয়া থাকিবে এবং জলও বেশী উপছিয়া পড়িবে।" তখনই রাজার সম্মুখে পরীক্ষা চলিল। এবং দেখা গেল যে খাঁটি সোণায় যতটা জল উপছাইয়া পড়িয়াছিল, মুকুটে তার চাইতে ঢের বেশী জল উপছাইয়া পড়িল। আর্কিমিডিস প্রমাণ করিলেন, মুকুট খাঁটি সোণায় প্রস্তুত নয়।

তখন সেই লোভী সেকরাকে ধরিয়া আনা হইল। হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া সেকরা সবই স্বীকার করিল এবং উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিল।

আর্কিমিডিস্ সেদিন যেরূপ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেরূপ আনন্দ-ভোগ পৃথিবীর অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

জাহাজ পোড়ান।

এমন একদিন ছিল, যখন রোমক ছিল তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তাহারা ছিল যোদ্ধার জাতি। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষই যোদ্ধা, অনেকেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত। শুধু তাই নয়, তাহাদের বন্দরে বন্দরে প্রকাণ্ড যুদ্ধ-জাহাজ-গুলি বিপক্ষের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

অবশ্য এখনকার যুদ্ধের জাহাজের সঙ্গে তখনকার জাহাজের তুলনা হয় না। এখন জাহাজগুলি তৈয়ারী হয় লোহার দ্বারা—যেমন একখানা লোহার কড়া জলে ভাসে, তেমনি একখানা লোহার জাহাজ জলের উপর ভাসিতে থাকে। কিন্তু তখনকার জাহাজ ছিল সব কাঠের তৈয়ারী। কাপড়ের পালে হাওয়া লাগিয়া কিম্বা দাঁড়ের সাহায্যে জাহাজ চলিত। তাই সেগুলি আজকালকার যুদ্ধ-জাহাজের মত অত

মজবুত হইত না। কিন্তু তথাপি তখনকার দিনে সেই জাহাজের ভয়েই সকল জাতি থরহরি কাঁপিত।

এক সময়ে রোমবাসীরা সাইরাকিউসবাসীদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সাইরাকিউস্ ক্ষুদ্র নগর, তাহাদের যুদ্ধের আয়োজনও অল্প. রোমক-দের মত যুদ্ধ-জাহাজও তাহাদের তত ছিল না।

রোমবাসীরা ক্ষুদ্র সাইরাকিউস্ নগরটি জয় করিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছিল। তাহারা মতলব করিল, জাহাজে করিয়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া একেবারে সাইরাকিউস্ নগরে প্রবেশ করিবে। অনেকগুলি জাহাজ সাজাইয়া তাহারা যুদ্ধ-যাত্রা করিল।

এদিকে সাইরাকিউস্‌বাসীরা যখন শুনিল যে রোমের যুদ্ধ-জাহাজগুলি তাহাদের দেশ অধিকার করিতে আসিতেছে, তখন তাহারা ত ভয়ে একে-বারে আধ-মরা হইয়া গেল। তাহারা নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কি-মিডিসের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—'রক্ষা

কর। রোমকদের হাত হইতে আমাদের দেশকে বাঁচাও।”

আর্কিমিডিস সব কথা শুনিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে, সূর্য্যের আলোক-সম্মুখে আয়না ধরিলে সূর্য্যালোক আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া ঠিকরাইয়া পড়ে। আর্কিমিডিস্ ভাবিলেন, ঐরূপ অনেকগুলি আয়নার দ্বারা সূর্য্যালোককে প্রতিফলিত করিয়া ঠিক একই স্থানে যদি ফেলা যায়, তবে সে স্থানের আলোকের তেজ এত তীব্র হইবে, যাহাতে সে স্থানে যাহা কিছু থাকিবে, তাহাই জ্বলিয়া যাইবে।

আর্কিমিডিস্ ভাবিলেন এ উপায় ত মন্দ নয়, —ইহার দ্বারা রোমকদের জাহাজগুলি বেশ সুচারুরূপে ভস্মীভূত করা যাইতে পারে।

যেমনই মনে করা অমনি কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। তিনি অনেকগুলি আয়না লইয়া ঈষৎ অর্দ্ধ-

চন্দ্রাকারে এমন ভাবে সেগুলিকে সাজাইলেন যে সূর্য্যের আলোক্-রশ্মিগুলি যেখানির উপরেই পড়ুক না কেন, তাহা হইতে প্রতিফলিত হইয়া ঠিক একই স্থানে পড়িবে।

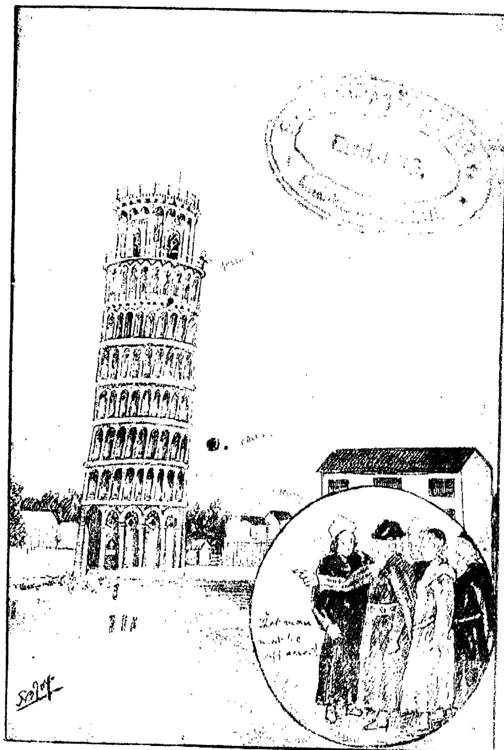
এইরূপে আয়নার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি সমুদ্রের তীরে নগর প্রাচীরের উপর তাহা স্থাপিত করিয়া রোমীয় জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রে সমুদ্রের ঢেউগুলি চিক্‌-মিক্ করিতেছিল, তাহার উপর দিয়া রোমবাসী-দের যুদ্ধ-জাহাজগুলি সারি বাঁধিয়া সাইরাকিউস্ নগর জয় করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা আর্কিমিডিসের আয়নার খবর কিছুই জানিত না,—তাই মহাস্ফূর্ত্তিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছিল,—মনে করিতেছিল, সাইরা-কিউসবাসীদের কয়টা সৈন্যকে তো তাহারা নামিবামাত্র হারাইয়া দিবে।

এদিকে আর্কিমিডিস্ যখন দেখিলেন যে

রোমবাসীদের যুদ্ধ-জাহাজগুলি ঠিক জায়গায় আসিয়াছে, তখন তিনি তাঁহার আয়না ঘুরাইয়া সূর্য্যের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া জাহাজগুলির উপর ফেলিলেন। অমনি জাহাজগুলিতে আগুন লাগিয়া গেল। কেহ বুঝিল না, কেহ জানিল না, কোথা হইতে আগুন আসিল ;—কেবল সভয়ে সকলে দেখিল সমস্ত জাহাজগুলিতে আগুন ভীষণ ভাবে জ্বলিতেছে। রোম-সৈন্যের যুদ্ধ-জয়ের স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল। তখন প্রাণের ভয়ে কেহ বা সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল ; কেহ জাহাজের মধ্যেই পুড়িয়া মরিল। যাহারা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহারাও সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষে ডুবিয়া মরিল। একজনও বাঁচিল না।

এইরূপে বিজ্ঞানের একটা তথ্যের আবিষ্কার হইল—একটা জাতির স্বাধীনতা বজায় রহিল,—একটা বিজয়গর্ব্বোন্মত্ত জাতির দর্প চূর্ণ হইল।



দুইটী বলই এক সঙ্গে পড়িল।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে—পৃঃ ২:

গেলিলিও।

আচ্ছা তোমরা বলত শূন্যে একটা খুব ভারী জিনিস আর একটা খুব হাল্কা জিনিস যদি ঠিক একই সময়ে ছাড়া হয়, কোনটি আগে ও কোনটি পরে পড়িবে ?

ভারী-জিনিসটা, কি বল! শুধু তোমরা কেন, একদিন সমস্ত লোকই সে কথা বলিত। সে ভুল বিশ্বাসটি যিনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—তাঁর নাম ছিল গেলিলিও।

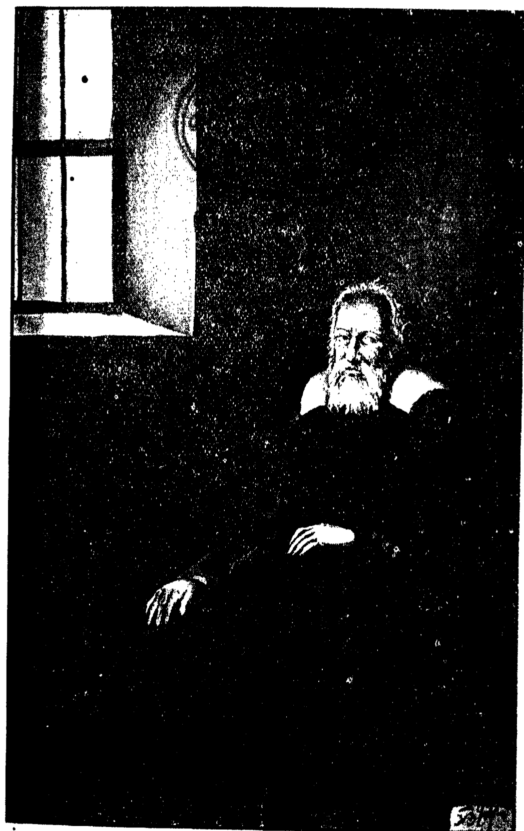
কিন্তু তোমাদের এই ধারণাটা যে ভুল, তাহা তোমরা নিজেরাই অতি সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

একটী পয়সা এবং পয়সার মাপে কাটা এক টুকরা কাগজ—এই দুইটীর মধ্যে পয়সাটা যে কত বেশী ভারী, তাহা তোমরা সকলেই জান। এখন কাগজটী যদি পয়সাটীর ঠিক উপরে রাখিয়া কোনও

উঁচু জায়গা হইতে দুইটীকে একত্রে ফেলিয়া দাও, তবে দেখিবে যে পয়সাটি ও কাগজটী একই সঙ্গে মাটিতে পড়িবে। বেশী ভারী বলিয়া পয়সাটি আগে পড়িবে না।

অবশ্য পয়সাটা আর কাগজ-টুকরা আলাদা করিয়া ফেলিলে, পয়সাটীকেই শীঘ্র পড়িতে দেখা যায়,—তাহার কারণ বায়ুর মধ্য দিয়া পড়িবার সময় হাল্কা কাগজের গতি যতটা প্রতিহত হয়, ভারী পয়সার গতি ততটা হয় না। হাওয়ার বাধা যদি না থাকিত, তবে উঁচু হইতে ফেলিলে সকল জিনিসই একই সময়ে মাটিতে পড়িত।

পাইসা নগরে এক হেলান টাওয়ার ছিল। (মনুমেণ্টের মত উঁচু বাড়ীকে টাওয়ার বলে।) গেলিলিও সেই টাওয়ারে উঠিয়া দুইটি লোহার বল,—একটি অপেক্ষা অন্যটি শতগুণে ভারী—একই সময়ে ছাড়িয়া দিলেন, আর বলিলেন—দুইটিই একই সময়ে মাটীতে পড়িবে। তাহাই ঠিক



পুরস্কার পাইলেন- কারাঘর।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে—পৃঃ ২৫।

দেখা গেল। লোকে গেলিলিওর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা যাঁরা—তাঁরা কিন্তু গেলি-লিওর উপর ভারী-চটিয়া গেলেন। এক ত তাঁদের শিক্ষাকে ভুল প্রমাণ করা হইয়াছে, সেজন্য রাগ ছিল, তাহার উপর আবার ছাত্রেরা পর্য্যন্ত গেলিলিওর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া রাগটা বাড়িয়াই গেল। তাঁহারা যে কোন উপায়ে গেলিলিওকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখিয়া লইব, আমাদের উপর বিদ্যা ফলান।"—

চেষ্টাও সফল হইল। গেলিলিওকে জেলে যাইতে হইল!

এখন কেহ একটা কিছু আবিষ্কার করিলে চারি দিকে কত সাড়া পড়িয়া যায়, আর তখন বিজ্ঞানের একটা সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া গেলিলিও পুরস্কার পাইলেন—শ্রীঘর।

সেখানে গিয়াও তাঁর উৎসাহ যে কিছুমাত্র কম হইয়াছিল—তাহা নহে। সেখানে বসিয়াই তিনি

আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে—পৃথিবী দিনের মধ্যে একবার করিয়া ঘুরিতেছে , এবং এইরূপে সবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে বৎসরে একবার করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ।

এ তথ্য তাঁর আগে ইউরোপের কেহই জানিত না । অবশ্য ভারতবর্ষে গেলিলিওরও আগে আর্য্যভট্ট এ তথ্য আবিষ্কার করিযাছিলেন ; কিন্তু গেলিলিও বা ইউরোপের অন্যান্য লোক তাহা জানিতেন না ।

পৃথিবী সবেগে ঘুরিতেছে, অথচ তোমরা তাহার উপর কেমন করিয়া স্থির রহিয়াছ, ইহা ভাবিয়া তোমরা বোধ হয় খুবই বিস্মিত হইতেছ ! —কথাটা কি রকম জান ? ধ'র—একটা বড় জালার গায়ে গোটা কতক পিঁপড়ে ছাড়িয়া দিয়া জালাটিকে যদি খুব ঘুরাও তবে দেখিবে—পিঁপড়েরা ঠিকই আছে ! জালাটা ঘুরিতেছে ।

এই পৃথিবীটি যেন একটি জ্বালা আর আমরা সব পিঁপড়ের দল ;—পৃথিবী যত ইচ্ছা ঘুরুক না কেন, আমাদের ঘুরিয়া পড়িবার ভয় নাই ।



আর্য্যভট্ট এ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

গেলিলিওর এই শুনিয়া পাদ্রীরা কিন্তু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন ;—কেননা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে নাকি লেখা আছে যে পৃথিবী একটী সোনার শিকল দ্বারা স্বর্গ হইতে ঝুলান আছে। তাঁহারা গেলিলিওর উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে গেলিলিওকে স্বীকার করিতে হইল যে, পৃথিবী স্থিরই আছে, সূর্য্যই তাহার চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছে।

পাদ্রীরা চলিয়া যাইবার পরই কিন্তু গেলিলিও অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"পৃথিবী কিন্তু ঠিক ঘুরিতেছে।"

গেলিলিও কিম্বা পাদ্রীর কথায় কি আসে ?

যাহা চিরকালের সত্য তা চিরকালই সত্যই থাকিবে।

দেখ, এমন দেশও ছিল যেখানে গুণীর এমনই দুর্দ্দশ যাহা হউক, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই

সকল সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়াছে। এখন প্রায় সব দেশেই গুণের আদর হইয়াছে, গুণী পূজা পাইয়া থাকেন।

এই সেদিনও আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কত সম্মান ও অর্থ পাইয়াছেন।

তোমরা কি কোন একটা আবিষ্কার করিয়া জ্ঞান প্রসারিত করিতে পার না? কত ছোট-খাট জিনিস তোমাদের হাতে আসে যায়, হয় ত সেগুলির মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করিতে পার—চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

———



ফলটা পড়িল কেন ?

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে—পৃঃ ২৭

ফলটী পড়িল কেন ?

ইংলণ্ডের উল্‌স্‌থরপ্‌ সহরের একটী বাগানের মধ্যে আপেল গাছগুলিতে কাঁচা পাকা অনেক-গুলি ফল ঝুলিতেছিল। একটী যুবক তাহারই একটী গাছের তলায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছে। হঠাৎ একটী আপেল ফল গাছ হইতে যুবকের সম্মুখে মাটিতে পড়িল। যুবক ফলটীকে পড়িতে দেখিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল, 'আচ্ছা, ফলটি পড়িল কেন ?' যুবক ভাবিতে লাগিল।

তোমরা হয়ত মনে করিবে,—শুধু তোমরা কেন, তোমাদের আগে অনেক পণ্ডিতেও একথা বলিয়াছেন—"লোকটী ত ভারী বোকা! ফল পাকিলেই গাছ হইতে পড়িয়া যায়, সে তো সবাই জানে। শূন্যে বুঝি কিছু থাকিতে পারে ?"

কিন্তু না, যতটা ভাবিতেছ,—কথাটা মোটেই অত সোজা নয়।

আবিষ্কারের গল্প।

আমার কথা বোধ হয় তোমাদের নিকট হেঁয়ালীর মত শুনাইতেছে। আচ্ছা ঐ যে বইখানা ঐখানে পড়িয়া রহিয়াছে; কখনও যদি কেহ ঐটাকে পিছন হইতে ধাক্কা না দেয় বা সম্মুখ হইতে না টানে, তবে কি উহা ঐ স্থান হইতে আপনা-আপনি কোথাও চলিয়া যায়? তাহা তো যায় না! বইখানি যে স্থানে আছে, সেই স্থান হইতে নড়িবে তখনই—যখন কেহ উহাকে ধাক্কা দিবে, বা উহাকে ধরিয়া টানিবে, বা অন্যত্র লইয়া যাইবে।

তাই যদি হয়, তবে ফলটীকে যদি কেহ নীচের দিকে ধাক্কা না দেয়; অথবা নীচের দিক হইতে যদি কেহ না টানে, তবে সেই বা নীচের দিকে পড়িবে কেন? যেখানে ছিল, ঠিক সেই স্থানেই তো ঝুলিয়া থাকা উচিত ছিল। আর নীচের দিকেই যদি পড়ে, তবে উপরের দিকেই বা যাইবে না কেন?

যুবকটিও ঠিক এই কথাগুলিই ভাবিতেছিল।

ভাবিতে ভাবিতে সে ঠিক করিল, উপর হইতে যখন কেহ ধাক্কা দিতেছে না, তখন নীচে হইতে পৃথিবী নিশ্চয়ই ফলটীকে টানিতেছে। শুধু ফলটী নয়, আমাকে, তোমাকে, চেয়ারকে, টেবিলকে সকল-কেই পৃথিবী কেবল নিজের দিকে টানিতেছে। তাই কোনও জিনিস শূন্যে থাকিতে পারে না—ঢিলটীকে আকাশে ছুড়িলে, সেও যেমন মাটিতে ফিরিয়া আসে, খোলা ছাদের উপর হইতে—আকাশের ঘুড়ি দেখিতে দেখিতে দুরন্ত ছেলে পা পিছলাইলে —সেও তেমনি নীচে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গে।

তোমরা হয়ত ভাবিবে, "আচ্ছা পৃথিবী যে সব জিনিসকে টানে, কিন্তু পৃথিবীর হাত কোথায়? পৃথিবীর সহিত শূন্যের জিনিসের যোগই বা কোথায়? দড়ি অথবা অমনি একটা কিছু দিয়া না বাঁধিয়া তো আর দূরের জিনিস কাছে টানিয়া আনা যায় না।"

ইহার উত্তরে সেই যুবক হয়ত বলিত, "আচ্ছা, তোমরা কখনও চুম্বক দেখিয়াছ? চুম্বক ত

আবিষ্কারের গল্প।

লোহাকে টানে, কিন্তু চুম্বকের কি হাত আছে? না লোহাকে টানিবার জন্য চুম্বকের কোনও দড়ির আবশ্যক হয়? পৃথিবীও সেই রকম সকল জিনিস টানে, সেজন্য তাহার হাতেরও দরকার নাই, দড়ি দিয়া বাঁধিবারও দরকার নাই। পৃথিবীর এই আকর্ষণ করিবার শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে।

সেদিন ফলটীকে পড়িতে দেখিয়া যুবক যাহা ভাবিয়াছিল, আজ পৃথিবীর সকল জ্ঞানীলোকই তাহা সত্য বলিয়া মনে করেন;—আর সেদিনকার সেই আপেল ফল-টীর পতনের জন্য যে তথ্যটীর আবিষ্কার হইয়াছে, আজ বিজ্ঞান-জগতের সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া-কলাপের ভিত্তি সেই তথ্যটীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

তোমরা বোধ হয়, এই যুবকের নাম শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছ? তাঁহার নাম আইজাক নিউটন। ভবিষ্যতে ইনি মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। তোমরাও কি বড় হইয়া তাঁর মত এক জন হইবে না?

রেলগাড়ীর উৎপত্তি।

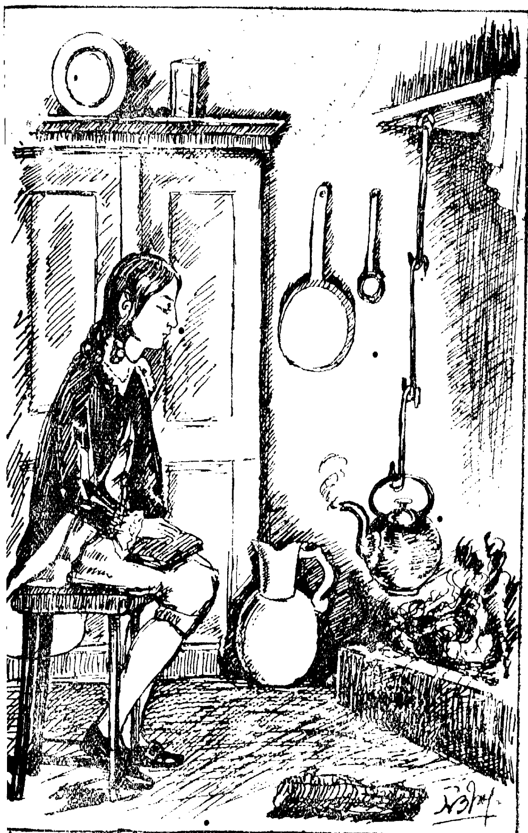
তোমরা এখন কত রেলগাড়ী দেখিতে পাও—রেলগাড়ী না হলে তোমাদের Changeএ (বায়ু পরিবর্ত্তনে) যাওয়া চলে না; তীর্থ ধর্ম্ম করা চলে না;—দেশ-ভ্রমণও চলে না।

খাদ্য যেখানে জন্মে, সেখান হইতে তাঁহা তোমার নিকটে আনিতে হইলে রেলগাড়ী চাই। তোমার কাপড়. জামা, জুতা,—তোমার বই, কাগজ, পেন্সিল,—তোমার সখের জিনিসপত্র সবই রেল-গাড়ীতে করিয়া তবে তোমার নিকট উপস্থিত হয়।

কিন্তু এই রেলগাড়ীর জন্ম কি করিয়া হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। কতটুকু সামান্য ব্যাপার—যাহা রোজই ঘটিতেছে—তাহা দেখিয়া কেমন করিয়া রেলগাড়ীর মত এমন একটা বিরাট জিনিসের আবিষ্কার হইল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়।

আবিষ্কারের গল্প।

ইংলণ্ডের এক গৃহস্থের বাড়ীতে, একদিন সকাল বেলায় একটা উনানের উপর, একটা লোহার কেট্‌লিতে করিয়া চায়ের জল গরম হইতেছিল! তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত চা খাও, অনেকে হয়ত খাও না। আমাদের গরম দেশে চা খাওয়ার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা নাই— কিন্তু ইংলণ্ড শীতের দেশ; সেখানে সবাই সকালে উঠিয়া চা খায়;—তাই সেদিনও চায়ের জন্য জল গরম হইতেছিল। যে বৃদ্ধা জল গরম করিতে-ছিলেন, কি একটা কাজে, তাঁহার বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। পাশেই তাঁহার বালক নাতিটী বসিয়াছিল। বৃদ্ধা তাহাকেই কেট্‌লির জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গেলেন। তোমার মত বয়সেরই বালক সে। হাতে কোন কাজ নাই, সে বসিয়া, বসিয়া, কখন কেট্‌লির মুখ হইতে ভক্‌ ভক্‌ করিয়া ধোঁয়ার মত বাষ্প বাহির হইবে, সেই আশায় চাহিয়া রহিল।



বালক বসিয়া বসিয়া ইহা লক্ষ্য করিল

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে— পৃঃ

কিছুক্ষণ পরে অল্প অল্প বাষ্প কেট্‌লির নল হইতে বাহির হইতে লাগিল; ক্রমে জল ফুটিলে বাষ্পের তেজও বাড়িল। বালক এক মনে দেখিতে লাগিল;—কিছুক্ষণ পরেই কেট্‌লির মুখের ঢাক্‌নিটি মাঝে মাঝে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল, এবং খানিকটা করিয়া বাষ্পও বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। কেট্‌লির ভিতরের জল তখন টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; যতখানি করিয়া বাষ্প ভিতরে জন্মাইতেছিল, তাহার সবটুকু কেট্‌লির নলের ছোট মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিতেছিল না। তাই কেট্‌লির ভিতরে বাষ্পের চাপ বেশী হওয়ায় মাঝে মাঝে কেট্‌লির ঢাক্‌নি ফাঁক হইয়া খুলিয়া খানিকটা করিয়া বাষ্প বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বালক বসিয়া বসিয়া ইহা লক্ষ্য করিল। বালকের বুদ্ধি;—সেই বুদ্ধি-বশে বালক মনে করিল, "আচ্ছা, ওই যে কেট্‌লির মুখ দিয়া মাঝে মাঝে বাষ্প বাহির হইয়া যাইতেছে; আমি

আবিষ্কারের গল্প।

যদি উহার মুখটী আটকাইয়া ধরি,—বাষ্প বাহির হইতে না দিই, তাহা হইলে কি হয়? দেখিতে হইবে।" যেমনই বালকের এই কথা মনে হইল, অমনি বালক, পাশে একখানা কাঠ পড়িয়াছিল, সেই কাঠখানা লইয়া তাহার সাহায্যে কেট্‌লির ঢাক্‌নিটি চাপিয়া ধরিল।

তথাপি একটু পরেই আবার কেট্‌লির ঢাক্‌নি খুলিয়া গেল, এবং খানিকটা বাষ্প বাহির হইয়া পড়িল। বালক তখন তাহার গায়ে যত জোর ছিল, তত জোরে কাঠখানা কেট্‌লির ঢাক্‌নির উপর চাপিয়া ধরিল;—কিন্তু বাষ্পের বাহিরে আসিবার পথ আটকাইতে পারিল না; আবার ঢাক্‌নি খুলিল—আবার বাষ্প বাহির হইল।

যখন কিছুতেই আটকাইতে পারিল না; তখন বালক ভাবিতে লাগিল, "বাষ্পের এত জোর! আমাকে ঠেলিয়া আসিল। তবে তো আমার চেয়ে অনেক ভারী জিনিসকেও বাষ্প এমনি করিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। সেইদিন

হইতে বালক ভাবিতে লাগিল, বাষ্পের এই প্রচণ্ড শক্তিকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইবে—এবং সেই চিন্তার ফলে রেল গাড়ীর উৎপত্তি।

কতটুকু সামান্য ব্যাপার! মুখ-ঢাকা ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ী হইতে যখন ধোঁয়া উঠিতে থাকে, তখন তোমরা অনেকেই তাহা দেখিয়াছ। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কয়জনে এই বালকের ন্যায়, সেই সামান্য ব্যাপার হইতে রেল গাড়ীর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছ?

এই বালকের নাম জেম্‌স ওয়াট। নিউটনের ন্যায় ইনিও একজন ইংরাজ। আজ ইঁহাদের জগৎজোড়া নাম। সবাই সম্মান করে,—সবাই পূজা করে। বড় হইয়া তোমরাও কি এই রকম একটা কিছু আবিষ্কার করিতে পারিবে না?

———

আকাশে উড়া

প্রথম প্রস্তাব

বেলুন।

উড়িবার ইচ্ছাটি মানুষের বহুদিনের রামায়ণে পুষ্পক রথের কল্পনা, গ্রীক পুরাণে ডিডেলাস্ ও তাহার পুত্র ইকেরাসের পাখীর মত ডানা লাগাইয়া আকাশে উড়িবার গল্প হইতেই বুঝা যায়, মানুষ কত প্রাচীন যুগ হইতে আকাশে উড়া সম্বন্ধে কত জল্পনা কল্পনা করিয়াছে। অবশ্য এই উড়িবার কল্পনাটা মানুষের মাথায় ঢুকিয়াছিল, পাখীর উড়া দেখিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষ নিজেকে প্রাণী-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া অহঙ্কার করে, অথচ আজন্মকাল হইতে মানুষ দেখিয়া আসিতেছে, তাহার চক্ষের সম্মুখে কত পাখী আকাশে উড়িয়া

বেড়ায়, স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করে ; কিন্তু মানুষের নিজের আকাশে উড়িবার কোনও শক্তি নাই— ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? শরীরে ডানা লাগাইয়া তাহার সাহায্যে আকাশে উড়া যদি সম্ভবপর হইত, তবে মানুষ অনেকদিন পূর্ব্বেই সে কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার কলঙ্ক মোচন করিত। মানুষ হিসাব করিয়া দেখিল যে পাখী ইত্যাদির তুলনায় মানুষের শরীর এত ভারী যে মানুষকে আকাশে তুলিতে হইলে অন্ততঃ ১৪ হাত করিয়া লম্বা এক একখানা ডানার আবশ্যক ; এবং ১৪ হাত লম্বা ডানাও যদি বা তৈয়ার করা যায়, তথাপি তাহা পাখীর ন্যায় নাড়িতে চাড়িতে হইলে যতখানি হাতের জোর দরকার, সে জোর মানুষের নাই! কাজেই পাখীর মত ডানা মেলিয়া আকাশে উড়িবার কল্পনাটা মানুষ অনেকদিন পর্য্যন্ত আপনার মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিল—সে বিষয়ে বড় আর একটা উচ্চবাচ্য কেহ করিল না।

আবিষ্কারের গল্প।

কিন্তু প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে—একদিন মানুষের মাথায় আকাশে উড়িবার সম্পূর্ণ এক নূতন ফন্দী উদয় হইল, এক অতি সামান্য দৈনিক ঘটনা হইতে। সেই কথাই এখন তোমাদিগকে বলিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটা ব্যাপার বুঝা দরকার। কেন না তাহা চোখে দেখা যায় না।

মাথার উপর এই যে দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশ দেখিতে পাও, ইহা কি শুধুই শূন্য? তাহা তো নয়। এই অসীম দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশের সমস্তই বায়ুতে ভরা। প্রকৃতি যখন শান্ত থাকে,—তখন মানুষ উহা ততটা অনুভব করিতে পারে না;—কিন্তু যখন ভীম বেগে ঝড় উপস্থিত হয়—তখন মানুষ এই বায়ুর সত্ত্বা বেশ উপলব্ধি করিয়া থাকে। সমুদ্রের মধ্যে মৎস্য প্রভৃতি জল-জন্তুরা যেমন নিরুপদ্রবে বাস করে, ইতস্ততঃ বিচরণ করে—অথচ তাহাদের চারিদিকে অনন্ত জলরাশি তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে;—আমরাও তেমনি

এই অসীম বায়ু-সমুদ্রের মধ্যে নিরুদ্বেগে বাস করিতেছি—ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি,—আর আমাদের চারিদিকে অনন্ত বায়ুরাশি আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

আমরা সকলেই যে অনন্ত বায়ু-সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছি, এ কথাটা বোধ হয় তোমাদের কাছে নূতন নয়।—আর এ কথাও বোধ হয় তোমরা সকলেই জান যে, এক বাল্‌তি জলের মধ্যে একটা পাথরের কুচি ফেলিয়া দিলে, সে পাথর-কুচিটী বালতির নীচে পড়িয়া থাকে, অথচ সেই জলের মধ্যে এক টুক্‌রা শোলা ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিলে, উহা অতি শীঘ্র ভাসিয়া উঠে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়;—পাথর সমান আয়তনের জলের অপেক্ষা ভারী; কিন্তু শোলা সমান আয়তনের জলের অপেক্ষা হাল্কা।

তেমনি আমরা যে এই অনন্ত বায়ু-সমুদ্রের নীচে পড়িয়া আছি, তাহার কারণ—আমাদের গুরুত্ব হাওয়ার অপেক্ষা বেশী। কিন্তু এমন যদি

আবিষ্কারের গল্প।

কোনও জিনিস থাকে, যাহার গুরুত্ব হাওয়ার অপেক্ষা কম, তবে তাহা আমাদের মত হাওয়ার নীচে না পড়িয়া থাকিয়া এই অনন্ত বায়ু-সমুদ্রের উপরে ভাসিয়া উঠিতে চাহিবে—দড়ি দিয়া পৃথিবীর সহিত বাঁধিয়া না রাখিলে, তাহা কেবলই উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া অসীম নীলের মধ্যে মিশাইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে।

ফরাসী দেশে ষ্টিফেন মণ্টগল্‌ফিয়ার ও জোসেফ মণ্টগল্‌ফিয়ার নামে দুই ভাই বাস করিত। উনানের আগুন হইতে কাল কাল গরম ধোঁয়া-গুলিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশের দিকে উঠিতে দেখিয়া একদিন তাহারা ভাবিল, "আচ্ছা, জোর করিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া না দিলে সকল জিনিষই তো পৃথিবীর দিকেই পড়ে, তবে ধোঁয়াই বা পৃথিবীর দিকে না পড়িয়া শূন্যের দিকে উঠিয়া যায় কেন? নিশ্চয়ই ধোঁয়া হাওয়ার অপেক্ষা হাল্কা, আর সেই জন্যই উহা হাওয়াকে ঠেলিয়া উপরে উঠে।"

দুই ভাই ভাবিতে লাগিল, ধোঁয়া আকাশে উড়িবার এই ক্ষমতাটাকে কি প্রকারে কাজে লাগাইবে ?

কালীপূজার সময়ে তোমরা যেমন কাগজের ফানুষ উড়াইয়া থাক, দুই ভাই সেই রকম একটী কাগজের বেলুন তৈয়ার করিল—করিয়া তাহার মধ্যে গরম ধোঁয়া পুরিয়া ছাড়িয়া দিয়া দেখিল যে বেলুনটী প্রায় হাত খানেক উঠিয়া আবার মাটীতে পড়িয়া গেল।

ঘরের মধ্যে দুই ভাই এইরূপে বেলুন উড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল ;—জানালাটী খোলা ছিল ,—সেই খোলা জানালার পথে রাশি রাশি ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া তাহাদের এক প্রতিবেশী মনে করিল যে মণ্টগল্‌ফিয়ার্‌দের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। প্রতিবেশী তখনই তাহাদের সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিল ;—কিন্তু যখন দেখিল যে আগুন টাগুন কিছুই লাগে নাই,—তখন অত্যন্ত নিবিষ্টমনে দুই ভ্রাতার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বারবার চেষ্টা করিয়াও যখন দুই ভাই বেলুন-টীকে হাত খানেকের বেশী উড়াইতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িল। অথচ তাহারা ভাবিয়া পাইতেছিল না, বেলুনটী কি জন্য আর উপরে উঠিতেছে না। প্রতিবেশীটি খানিকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, বেলুন হাতখানেক উঠিতে না উঠিতেই, উহার মধ্যের ধোঁয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে; যদি আগুনের পাত্রটা বেলুনের নীচে বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তবে বোধ হয় বেলুনটা অনেক দূর উঠিতে পারে।" প্রতিবেশীর পরামর্শ-মত আগুনের পাত্রটা তখন বেলুনের নীচে বাঁধিয়া দেওয়া হইল—এইবার বেলুনটা উড়িয়া ছাদ স্পর্শ করিল।

আসল কথা হইতেছে এই যে, গরম ধোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে অনেক হাল্কা; এখন বেলু-নের নীচে আগুনের পাত্রটা বাঁধিয়া দেওয়ায়, সেই আগুনের তাপে বেলুনের ভিতরকার ধোঁয়া সব সময়ই বেশী গরম থাকিল;—সুতরাং বেলুনের

বাহিরের চারি পার্শ্বের ঠাণ্ডা বাতাসের তুলনায় সেই ধোঁয়া শুদ্ধ বেলুন সব সময়েই হাল্কা থাকায়, বেলুন ক্রমাগতই উপরে উঠিতে লাগিল।

এইরূপে তাহাদের বেলুনটীকে ছাদ পর্য্যন্ত উড়াইতে সমর্থ হইয়া, মণ্টগল্‌ফিয়ার্ ভ্রাতৃদ্বয় আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাহারা ঘর ছাড়িয়া খোলা বাতাসে বেলুন উড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—এবং একটী বেলুনকে মাটি হইতে প্রায় ৭০ হাত উঁচু পর্য্যন্ত উড়াইতে সমর্থ হইল।

এইরূপে বেলুন-সৃষ্টির সূত্রপাত হইল! এই যে কালীপূজার সময় রাশি রাশি ফানুষ আকাশে উড়াইয়া তোমরা কত না আমোদ উপভোগ করিয়া থাক, সে সমস্তই মণ্টগল্‌ফিয়ার্ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সেই বেলুনেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। এবং এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিয়াছ যে, ফানুষ উড়াইবার সময় যে ফানুষের নীচে লোহার সরু তারে বাঁধা নেকড়ার গুলিটী কেরো-

সিন তৈলে ভিজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়, তাহার প্রয়োজনীয়তা কি?

মণ্টগল্‌ফিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ইহার পর একদিন এক প্রকাণ্ড বেলুন প্রস্তুত করিয়া (পরিধি ৬০ হাত) বহু লোকের সম্মুখে আকাশে উড়াইল। বেলুনটী প্রায় দেড় মাইল উঁচুতে উঠিয়া, উড়াইবার স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে নামিল। এই ঘটনায় সমস্ত ইয়োরোপময় সাড়া পড়িয়া গেল;—এবং ইহার কিছুদিন পরে প্যারিসের বিজ্ঞান সভা ষ্টিফেন মণ্টগল্‌ফিয়ারকে প্যারিসে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন, এবং তদ্দ্বারা বেলুন তৈয়ার করিয়া সকলের সমক্ষে উড়াইয়া দেখাইতে বলিলেন। ষ্টিফেন এক অতি-সুন্দর বেলুন তৈয়ার করিয়া, বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির সমক্ষে উহা আকাশে উড়াইলেন; এবারকার বিশেষত্ব হইল এই যে, বেলুনের সহিত একটা চুবড়ী বাঁধিয়া তাহার মধ্যে একটী ভেড়া, একটী মোরগ, এবং একটী হাঁসকেও উড়ান হইল।

স্থলচর জীবিত প্রাণী এই প্রথম আকাশ-পরিভ্রমণে চলিল। এই তিনটী নিরীহ প্রাণীর আকাশ-যাত্রা কিরূপে সম্পন্ন হইবে, সে সম্বন্ধে সকলের মুখে নানা রকম জল্পনা কল্পনা চলিল। কেহ বলিলেন যে, খুব উঁচুতে হাওয়া অত্যন্ত পাতলা, সুতরাং প্রাণী তিনটী দম আটকাইয়া মারা যাইবে। কেহ বা বলিলেন, উঁচুতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা;—সে ঠাণ্ডায় বেচারীরা জমিয়া মরিবে! কিন্তু যখন বেলুন পুনরায় নামিল, তখন দেখা গেল যে প্রাণী তিনটী বেশ সুস্থ রহিয়াছে,—যেন কিছুই হয় নাই।

পশু তিনটীকে বেশ নিরাপদে অবতরণ করিতে দেখিয়া, সকলের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তখন জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল, মানুষই বা তবে বেলুনে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কেন?

কিন্তু তথাপি মানুষের ভয় সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই; —কারণ, আকাশের যে অবস্থা কি, তাহা কাহারও জানা ছিল না; এবং দ্বিতীয়তঃ বেলুনের তলায় যে আগুনের কুণ্ডটী জ্বলিত, তাহার জন্য বেলুনের

দড়াদড়িতে প্রতি মুহূর্তেই আগুন লাগিবার সম্ভাবনা।

তখন প্রস্তাব হইল যে, মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দুইজন অপরাধীকে বেলুনে চড়াইয়া উড়াইয়া দেওয়া হউক,—মরিতে হয়—তাহারা মরিবে, —তাহাতে কাহারও ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। তারপর তাহারা যদি নিরাপদে অবতরণ করিতে পারে, তবে তখন না হয় অন্য অন্য লোকে আকাশে উড়িতে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। কিন্তু এই প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হইল না। অনেকেই বলিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রথম বিমানপথে বেড়াইবেন, পৃথিবীর সকল লোকে চিরকাল ধরিয়া তাঁহার সম্মান করিবে। সে সম্মান দুইজন মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর ভাগ্যে ঘটা উচিত নয়। পাইলেটের ডি রজিয়ার নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক বলিলেন যে তিনিই প্রথমে বেলুনে চড়িয়া আকাশে উড়িবেন।

এক প্রকাণ্ড বেলুন তৈয়ার করা হইল ; সেই

বেলুনে চড়িয়া রজিয়ার এবং মার্কুইস আর্‌লাণ্ডেস্‌ একদিন প্যারিস সহরের নিকট হইতে আকাশে উড়িলেন। বেলুন আধ মাইলটাক পথ খুব শীঘ্র উঠিল। তাহার পরে প্রবল বায়ু-স্রোত বেলুন-টাকে উল্টাপথে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। যাহা হউক অবশেষে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করি-লেন। কিন্তু, যতক্ষণ তাঁহারা বেলুনে ছিলেন, তত-ক্ষণ তাঁহাদের ভয় এবং উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। বেলুনের দড়িগুলায় প্রায়ই আগুন ধরিয়া যাইতে-ছিল,—কাজেই বেচারী আরোহীদ্বয়কে আগুন নিবাইতেই সমস্তক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল।

এই ভাবে গরম ধোঁয়ার সাহায্যে বেলুন উড়াইবার পত্তন হইল বটে,— কিন্তু ইহাতে অসুবিধা রহিল অনেক। প্রথমতঃ গরম ধোঁয়া বাতাসের অপেক্ষা হাল্কা হইলেও, তুলনায় খুব বেশী হাল্কা নয়; সুতরাং বেলুন প্রকাণ্ড না হইলে কোন ভারী জিনিসও যেমন তোলা যায় না, খুব বেশী উঁচুতেও তেমনি উড়িতে পারে না। এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

আপত্তি হইল এই যে, বেলুনের নীচে যে অগ্নি-কুণ্ডটা আবশ্যক হইত, সেইটার দরুণ বিপদের সম্ভাবনা ছিল পদে পদে।

এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে হাইড্রোজেন নামক একপ্রকার গ্যাস্ (বায়বীয় পদার্থ) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই গ্যাস অত্যন্ত হাল্কা;—ওজনে হাওয়ার প্রায় চৌদ্দভাগের একভাগ।

ঠিক হইল যে এই হাল্কা হাইড্রোজেন গ্যাস ভরিয়া বেলুন উড়ান হইবে। তখনকার দিনে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈয়ার করিতে অত্যন্ত খরচা পড়িত; তাই একটী ছোট বেলুন তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরিয়া প্রোফেসর চার্ল্সের তত্ত্বাবধানে ছাড়া হইল। এই বেলুনটী কাগজ দিয়া তৈয়ার করা হইল না,—কারণ দেখা গেল যে কাগজের মধ্যে দিয়া গ্যাস অতি শীঘ্র বাহির হইয়া যায়। তাহার বদলে সিল্কের কাপড় রবার ও টারপেণ্টাইনে বার্ণিশ করিয়া তাহা দ্বারা বেলুন তৈয়ার হইল। এই বেলুনে কোনও যাত্রী

উঠিল না। এই বেলুন ছাড়িয়া দিবামাত্র গরম ধোঁয়া-পূর্ণ বেলুন অপেক্ষা ইহা অনেক শীঘ্র উপরে উঠিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল আকাশ-পথে বিচরণ করিয়া ইহা প্রায় ১৫ মাইল দূরে এক মাঠের মধ্যে অবতরণ করিল। কথিত আছে, সেই মাঠের মধ্যে কতকগুলি কৃষক কাজ করিতেছিল। তাহারা যখন দেখিল যে আকাশ হইতে এক অদ্ভুত জানোয়ার উড়িয়া আসিয়া তাহাদের মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া যে যেখানে পারিল পলায়ন করিল।

তাহার পর সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া সেই বেলুনটার নিকট উপস্থিত হইল;—কেহ লাঠি দিয়া কেহ বা বর্শা দিয়া সেই অদ্ভুত জানোয়ারটাকে খোঁচা দিতে লাগিল। শঙ্কিত গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন একটী বন্দুক লইয়া দূর হইতে সেই বেলুনটার উপর অনেক গুলি গুলিবর্ষণ করিল। বেলুনটা ছিদ্র হওয়ায়—হুস্ হুস্ করিয়া খানিকটা গ্যাস বাহির

হইয়া গেল এবং তাহার আকারও অনেকটা কুঞ্চিত হইল। গ্রামবাসীরা তখন মনে করিল এই অদ্ভুত রাক্ষসটা গুলির প্রচণ্ড আঘাতে সবেগে নিশ্বাস ফেলিয়া একেবারে জন্মের মত মরিয়া গেল।

প্রথম যখন হাইড্রোজেন-বেলুন যাত্রী লইয়া আকাশে উঠিল, তাহার আরোহী হইলেন প্রোফেসর চার্লস্ ও তাঁহার সহকারী রবার্ট। প্রোফেসর চার্লস্ যখন দ্বিতীয়বার হাইড্রোজেন-বেলুনে চড়িয়া আকাশে উড়িলেন, তখন তিনি এক অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন; যখন তিনি বেলুনে উঠিয়া পৃথিবী ত্যাগ করেন, তখন তিনি সূর্য্যকে অস্ত যাইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু উঠিয়া দেখিলেন, সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই, এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই অস্ত গেল। একই দিনে তুইবার সূর্য্যাস্ত দেখা ইহার পূর্ব্বে আর কোনও মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

আকাশে উড়া।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এয়ারশিপ।

হাইড্রোজেন-বেলুন উদ্ভাবন করিয়া মানুষ আকাশে উঠিতে সমর্থ হইল বটে,—কিন্তু তখনও মানুষের আকাশের উপর আধিপত্য বিস্তারের অনেক দেরী। বেলুনকে ইচ্ছামত যে কোনও দিকে পরিচালিত করিবার কৌশল মানুষ তখনও করায়ত্ত করিতে পারে নাই; বিমান-বিহারী তখনও সম্পূর্ণরূপে বায়ু-স্রোতের অধীন।

কিন্তু বেলুন-উদ্ভাবনের পর প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত চালকের ইচ্ছানুযায়ী বেলুনের গতি নির্দ্দিষ্ট করিবার বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে দুই একজন বিমান-বিহারী যে একটু আধটু চেষ্টা না করিয়াছিলেন তাহা নহে। একজন বলিলেন, নৌকার উপর যেমন পাল

আবিষ্কারের গল্প।

তুলিয়া নৌকাকে ইচ্ছামত যে দিকে ইচ্ছা চালান যায়, সেইরূপ বেলুনের একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড পাল খাটাইয়া তাহার গতির দিক নির্দ্দিষ্ট করা হউক।" কিন্তু তাঁহার পরামর্শ-মত পাল খাটাইয়া দেখা গেল যে, তাহার দ্বারা বেলুনকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে চালান অসম্ভব; কেননা যখনই পাল ঘুরাইয়া বেলুনকে বায়ু-স্রোত হইতে বিভিন্ন দিকে চালাইবার চেষ্টা করা হইল, তখনই পালশুদ্ধ বেলুনটী বায়ু-স্রোতের অভিমুখে ঘুরিয়া গিয়া বায়ু-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

পাল যখন কোনও কাজে লাগিল না, তখন আর একজন প্রস্তাব করিলেন যে নৌকার ন্যায় হাইল ব্যবহার করিলে কি হয় দেখা উচিত। তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে, গঙ্গার উপরে যে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকা চলিতে থাকে,—নৌকার ঠিক পশ্চাতে অবস্থিত হাইলখানির সামান্য মাত্র সঞ্চালনে সেই নৌকার গতি কিরূপ নিমিষের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

বেলুনের সহিত হাইল জুড়িয়াও ঠিক সেই প্রকার তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালাইবার চেষ্টা হইল। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে এ রকম কেন হইল! নৌকার গতি যদি হাইল-সঞ্চালনে বিভিন্নমুখী হয়, তবে বেলুনের গতিই বা হইবে না কেন?

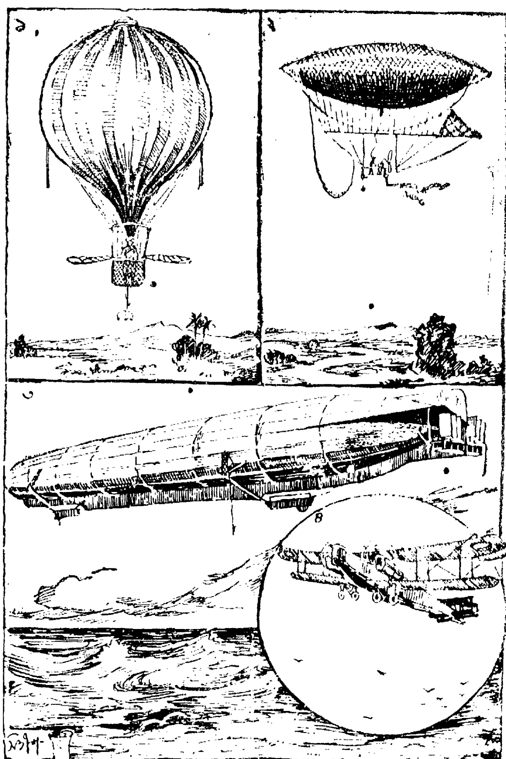
তোমরা যদি কখনও স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া ভাসিয়া চলিয়া থাক, এবং এইরূপে ভাসিয়া যাইবার কালে এমন যদি কোনও সময় আসিয়া থাকে যখন স্রোতের গতি এবং নৌকার গতি ঠিক সমান হয়; তাহা হইলে তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে, যতই কেন হাইল সঞ্চালন করা হউক না, নৌকার গতি সামান্যমাত্রও ভিন্নমুখী হয় না। কিন্তু যদি দাঁড় টানিয়া হউক বা পাল খাটাইয়া হউক, নৌকাকে স্রোতের বেগ অপেক্ষা জোরে চালান হয়, অথবা যদি কোনও

উপায়ে নৌকাকে স্রোতের অপেক্ষা মন্থর গামী করা যায়, তখন হাইলের সামান্যমাত্র সঞ্চালনে নৌকাকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালান যাইবে।

আকাশে যখন বেলুন বায়ুস্রোতে ভাসিয়া চলিতে থাকে, তখন বায়ুস্রোতের বেগ এবং বেলুনের গতির বেগ দুইই সমান থাকে, কাজেই বেলুনের সংলগ্ন হাইল হাজার ঘুরাইলেও বেলুনের গতির দিক্ একটুও পরিবর্ত্তিত হয় না।

অনতিবিলম্বেই সকলে বুঝিল যে, যদি কোনও উপায়ে বেলুনকে বায়ুস্রোতের অপেক্ষা জোরে অথবা ধীরে চালান যায়,—তবে হাইলের সাহায্যে বেলুনকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালানও সম্ভব হইবে

আজকাল মোটর-ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোটর ইঞ্জিনের সাহায্যে বেলুনের গতি অনেক পরিমাণে বাড়ান যাইতে পারে;—কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে মোটর ইঞ্জিনের



১।২ বেলুন। ৩ জেপেলিন। ৪ এরোপ্লেন।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে— পৃঃ ৫৪।

কথা কেহই জানিত না। লোকে বেলুনের গতি-বেগ বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করিতে লাগিল বটে ;—কিন্তু মোটর-ইঞ্জিন আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই ফল হইল না ;—আর সেই জন্যই বেলুনের উদ্ভাবন হওয়ার পরও এতকাল পর্য্যন্ত বেলুন মানুষের বিশেষ কোনও কাজে লাগে নাই। তারপর যখন মানুষ অপেক্ষাকৃত লঘু অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী পেট্রল ইঞ্জিনের সন্ধান পাইল, তখন হইতেই আকাশে নিত্য নূতন সম্ভাবনার পথ মানুষের নিকট উন্মুক্ত হইল ; তাহারই পরিণতিতে নানা ক্রম-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজকালকার—প্রকাণ্ড জেপলিনের সৃষ্টি হইয়াছে।

আকাশে উড়া।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এরোপ্লেন।

এয়ারশিপের উদ্ভাবনে মানুষ আকাশে ইচ্ছা-মত ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইল বটে,—কিন্তু ধরিতে গেলে প্রকৃত বিমান-বিজয় আরম্ভ হইল এরোপ্লেনের উদ্ভাবন হইতে। এয়ারশিপের উদ্ভাবন করিয়া মানুষ যখন তাহার সাহায্যে আকাশে উড়িল ;—তখন সে শুধু প্রাকৃতিক শক্তির সহিত সদ্ভাব করিয়া তাহাকে নিজের কাজে লাগাইল বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরোপ্লেনের উদ্ভাবন করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শক্তিকে তাহার উপর কাজে লাগাইল।

এতদিন যে সমস্ত যন্ত্র আকাশে উড়িতেছিল—বেলুন বা এয়ারশিপ,—সে সমস্তই মোটের উপর হাওয়ার অপেক্ষা হাল্কা, কিন্তু এরোপ্লেন হইল

হাওয়ার অপেক্ষা ভারী। বেলুন বা এয়ারশিপ আকাশে উড়িত, কেননা মোটের উপর তাহারা সমান আয়তনের হাওয়ার অপেক্ষা হাল্কা;—প্রকৃতির নিয়মই হইতেছে যে হাল্কা জিনিসটা উপরে ভাসিয়া উঠে। এরোপ্লেন কিন্তু আকাশে উড়িল উহার নিজের জোরে;—হাওয়ার অপেক্ষা ভারী হওয়ায় উহার নীচে পড়িয়া থাকিবারই কথা; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, পৃথিবীর আকর্ষণকে ("ফলটী পড়িল কেন" গল্পে দেখ) সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া উহা আকাশে উঠিতে থাকে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়, তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

মোটামুটি ধরিতে গেলে, এরোপ্লেনের আছে কেবল একটী কি দুইটী প্রকাণ্ড পাতলা (চেপ্টা) ধাতু নির্ম্মিত পাত; যাহাকে ইংরাজিতে "প্লেন" বলে;—আর একটী প্রচণ্ড শক্তিশালী মোটর ইঞ্জিন,—যাহার কার্য্যই হইতেছে সেই ধাতু নির্ম্মিত পাতটীকে অতিবেগে বায়ুর মধ্য দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া। একটা পাত-বিশিষ্ট

এরোপ্লেনকে মনোপ্লেন বলে, এবং যে সব এরো-প্লেনে দুইটী করিয়া পাত আছে, তাহাদিগকে বলে "বাইপ্লেন।" এখন একটা সোজা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিব, কেমন করিয়া এরোপ্লেন আকাশে উড়ে।

ভাঙ্গা চেপ্টা খোলামকুচি দিয়া তোমরা পুকুরের জলে নিশ্চয়ই ছিনিমিনি খেলিয়াছ। জলের উপর ক্ষুদ্র খোলামকুচিটি হাত ঘুরাইয়া সজোরে ছুঁড়িয়া দিলে উহা কেমন জলের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে কতদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়! এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত গতির বিশেষ হ্রাস না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার ভারে জলের নীচে ডুবিয়া যায় না, তাহা বোধ হয় তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। কিন্তু গতির হ্রাস হইলেই তখনই উহা জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়।

এরোপ্লেনের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এরোপ্লেনের প্রকাণ্ড চেপ্টা ধাতুনির্ম্মিত পাতখানা যেন একটা চেপ্টা খোলামকুচি;—পুকুরের জলের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে না গিয়া বায়ুস্তরের

উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত পাতটীকে মোটর সবেগে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাহা নিজের ভারে বায়ু স্তর ভেদ করিয়া নীচে নামিতে পারে না।

কবে কোন্ আদিযুগে যে মানুষ প্রথম ঘুড়ি উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা কাহারও জানা নাই। কিন্তু যেদিন হইতে মানুষ প্রথম ঘুড়ি উড়াইতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই মানুষ জানিয়া রাখিয়াছে যে ঘুড়ির ন্যায় কোনও চেপ্টা তলকে, যদি বায়ুর চাপের বিরুদ্ধে একটু কোণা-কুণিভাবে টানা যায়, তবে তাহা ক্রমাগতই উপরে উঠিতে থাকে। এবং যে বৈজ্ঞানিকই এই ঘুড়ি উড়ান সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে যদি এমন কোনও যন্ত্র আবিষ্কার করা যায়, যাহা দ্বারা ঘুড়িকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লওয়া সম্ভব হইবে, তাহা হইলে বিমান-বিজয়ের কৌশলও মানুষের মুষ্টির ভিতর আসিবে।

আবিষ্কারের গল্প।

তাই যখনই মানুষ মোটর-ইঞ্জিন আবিষ্কার করিল, তখনই সে কাগজের ঘুড়ির অনুকরণে এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়া মোটর-শক্তিকে উহা ঠেলিতে নিয়োগ করিল। অর্ভিল রাইট্ ও উইল্‌বার রাইট্ নামে আমেরিকাবাসী দুই ভাই এইরূপে প্রথম এরোপ্লেন সৃষ্টি করেন।

আজ বৈজ্ঞানিকের কতদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে ;—কত লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, —কত অমূল্য জীবনের বিনিময়ে, আজ তাহার সোণার স্বপ্ন সফল হইয়াছে ;—জল, স্থল ও শূন্যের অধিপতি হইয়া মানুষ আজ সত্য সত্যই জীব-জগতের —একচ্ছত্র সম্রাট্।

প্রাচীন কবি উপকথায় পক্ষ-সংযুক্ত পরীর ইচ্ছামত আকাশে উড়িবার কল্পনা করিয়াছেন ;— কিন্তু আজ যদি বিংশ শতাব্দীর এরোপ্লেনের সহিত উপকথার পরী পাল্লা দিতে আসিত, তবে সম্ভবতঃ তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া, অনেক নীচে পড়িয়া থাকিতে হইত।

(ক) বিবিধ।

১। নাবিকের দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র।

চীনুভায়াদের তোমরা সাধারণতঃ অবজ্ঞাই করিয়া থাক। হলুদবরণ রং, চেপ্‌টা নাক, সাদাসিধা ঢিলা প্যাণ্টলুনমাত্র সাজ, ইহা দেখিয়া তো প্রথমেই জাতিটার উপর ভক্তি চটিয়া যায়;—তাহার পর যখন শোনা যায় যে উহারা আরশুলা খায়, তখন সকলেই চীনুভায়াদের নাম শুনিয়া একবার নাসিকা না কুঞ্চিত করিয়া থাকিতে পারেন না। বেচারাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় তো কেবল চিনাবাজারের জুতার দোকানে! কাজেই তাদের উপর শ্রদ্ধা আসিবেই বা কি প্রকারে?

কিন্তু এই রকম একটা জাতির কতকগুলি মাত্র উড়ো লোক দেখিয়া, সেই জাতিটার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা যে

কতদূর ভ্রমাত্মক এবং অন্যায়, তাহা এই চীনেম্যান-দের দেখিলেই বুঝা যায়। বাস্তবিক এই চীনে-ম্যানদের মত শিল্পে দক্ষ কর্ম্মঠ লোক পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও চলে। একজন চীনে মজুর সাধারণতঃ তিনজন দেশী মজুরের সমান কাজ করে। তবে সাহেবদের মত চীনেদের অত সুশৃঙ্খলে কার্য্য-পরিচালন করিবার ক্ষমতা নাই।

শারীরিক সৌন্দর্য্যেও চীনেরা কোনও জাতির অপেক্ষা বড় হীন নহে;—বরঞ্চ অনেক সময়ে চীনেদের মধ্যে যেরূপ সুন্দর রূপ দেখা যায়, তাহা অন্য জাতির মধ্যে দুর্লভ।

প্রাচীন সভ্যতার গৌরবের ইতিহাস এক ভারতবর্ষ ছাড়া, চীনেদের মত আর কোনও দেশের নাই। হাজার হাজার বৎসর আগে যখন ইয়োরোপ, আমেরিকা, প্রভৃতি মহাদেশে কেবল অসভ্যদেরই বাস ছিল, বিশ্ব-সভ্যতায় চীনেরা তখন অতি উন্নতস্থান অধিকার করিয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই যখন অজ্ঞানের

অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই আদিম যুগে চীনবাসীরা যে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

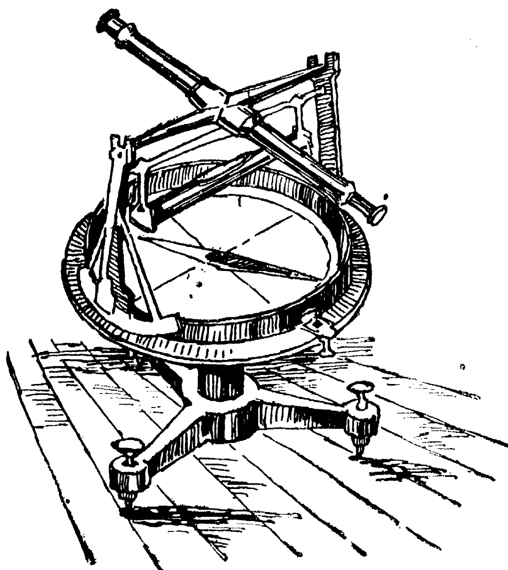
এই নাবিকের দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্র, যাহা সমুদ্র-গামী জাহাজের পক্ষে একপ্রকার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বস্তু বলিলেই চলে—সেই কম্পাসের উদ্ভাবন হইয়াছিল এই চীন দেশে।

দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রের উদ্ভাবনের পূর্বে সমুদ্র-পথে জাহাজের নিরাপদে চলাচল একপ্রকার অসম্ভব ছিল। অকূল সমুদ্রের মাঝখানে—যখন কোনও দিকে কূল কিনারার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না—সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত ঢেউয়ের মেলা—ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ—তাহার পরে, আরও পরে, অনন্ত ঢেউয়ের রাশি একের পশ্চাৎ হইতে আর একটা উঁকি মারিতে থাকে—সেই সময়ে দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্র না থাকিলে নাবিকের পক্ষে গন্তব্য পথ নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। জাহাজ কোন দিকে চলিতেছে, কোন্ দিকে চলিলেই বা পুনরায় কূলে নির্দ্দিষ্ট

স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে, তাহার কিছুই জানিবার উপায় থাকে না।

তাই দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ সাহস করিয়া সমুদ্রের মধ্যে বেশী দূরে যাইতে পারিত না। অবশ্য সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় একটা মোটামুটি দিকের আভাস পাওয়া যাইত; কিন্তু মেঘলা দিনে বা রাত্রিকালে তাহাও অসম্ভব ছিল। কখন যে মেঘ উঠিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? অগত্যা পথ হারাইবার ভয়ে তখন মানুষকে তীরের ধারে ধারে—তীরকে লক্ষ্য পথের অন্তর্গত রাখিয়া—সমুদ্রে জাহাজ চালাইতে হইত। কূল হইতে দূরে যে অসীম অনন্ত জলরাশি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে যে কত বিস্ময় লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহার সঠিক বিবরণ কেহ জানিতও না; তাহা জানিতে চেষ্টা করার দুঃসাহসও কাহারও ছিল না।

পথ হারাইবার ভয় ভাঙ্গিয়া মানুষকে প্রথম



দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্র।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে—পৃঃ ৫৩।

যাহা দূর সমুদ্রে অভিযান করিবার সাহস প্রদান করিল, তাহা একটী ক্ষুদ্র দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র। আর তাহারই উদ্ভাবক বলিয়া চীন যে তোমাদের নিকট হইতে কতখানি সম্মানের দাবী করিতে পারে, তাহা বোধ হয় তোমাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না।

চুম্বক লোহাকে যে আকর্ষণ করে, তাহা তোমরা সকলেই জান। কাঠির মত লম্বা একখণ্ড চুম্বকের ঠিক মাঝখানে যদি একটী সরু সূতা দিয়া বাঁধিয়া তাহাকে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলান যায়, তবে সে চুম্বকটী বার-কতক এদিক ওদিক দুলিয়া যখন স্থির হইবে, তখন দেখা যাইবে যে চুম্বকটী উত্তর এবং দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া আছে।

এই অত্যন্ত সোজা ব্যাপারটী হইতে দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্রের উৎপত্তি।

সূচের মত সরু ছোট একটী চুম্বক, মাঝখানের একটী ছিদ্রের সাহায্যে, একটী সরু দাঁড় করান কাঠির উপর ঝুলান আছে ;—ইহাই মোটামুটি

বিজ্ঞানের দান।

দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র। এই যন্ত্রটী যখন যেখানেই থাকুক না কেন, যন্ত্রের চুম্বকটী সব সময়েই উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকিবে। চুম্বকের যে দিক্‌টা উত্তর দিকে মুখ করিয়া থাকে, সেই দিকটায় একটা দাগ দেওয়া থাকে;—তাই জাহাজ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে থাকিলেও চুম্বকের দাগ দেওয়া মুখটা কোন্ দিকে ফিরিয়া আছে দেখিলেই বুঝা যায় যে, সেইটা উত্তর দিক। দিগ্‌ভ্রম হইবার আর কোন ভয় থাকে না।

২। মুদ্রাযন্ত্র।

দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনও সর্ব্ব প্রথম চীন দেশেই হইয়াছিল। যে মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলে আজ সভ্য জগতের পৌনে ষোল আনা কাজই অচল হইয়া যাইত;—যে মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলে এত অল্প মূল্যে পুস্তকাদি ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত, এবং তাহার ফলে কোটী কোটী লোকের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার অসম্ভব হইত, সেই অতি প্রয়োজনীয় মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া চীনেরা জগতের কত উপকার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আদিমযুগে যখন লেখার তেমন প্রচলন ছিল না, তখন আর্য্যের মুখে উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া লোকে শিক্ষা-লাভ করিত। হিন্দুর বেদ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থগুলি যে কতকাল পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত

ছিল, তাহার স্থিরতা নাই। তাহার পরে, যখন হইতে তাল-পত্রে পুস্তক লিখিবার প্রচলন হইল, তখন হইতেই বিদ্যার্থীর নিকট এক নূতন যুগের সূচনা হইল। আজিও অনেক হিন্দুর গৃহে প্রাচীন ছিন্নপ্রায় তাল-পত্রে লিখিত কত অমূল্য পুঁথি পাওয়া যায়। ইহার পরে যখন কাগজের সৃষ্টি হইল, তখন লিখিবার উপকরণের অভাব দূর হইল বটে, কিন্তু দ্রুত লিখিবার উপায়ের অভাবে শিক্ষা-বিস্তার আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিল না। হয়ত 'একখানি পুঁথি প্রস্তুত হইল; কিন্তু তাহার একখানি নকল লিখিতে প্রায় পনের দিন কাটিয়া যাইবে; তাহা হইতে পুনরায় আর একখানি নকল লিখিতে আরও কত দিন কাটিয়া যাইবে;—এইরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাওয়ায় মানুষের জীবনকালটা এদিকে যেমন কমিয়াই আসিতে থাকে, তাহার তুলনায় অন্য দিকে নকল পুস্তকের সংখ্যা কিন্তু তেমন আশানুরূপ বাড়িয়া যায় না।

ইহা ছাড়া, অন্য অসুবিধাও ছিল বিস্তর। নকলকারীর হাতের লেখা খুব সুন্দর না হইলে পুস্তক অনায়াসে পাঠ করা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার সুন্দরভাবে লিখিত একখানি মাত্র নকল পাইতে হইলে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় করিতে হইত। সাধারণ লোকের অত অর্থও যেমন ছিল না, অত অর্থ-ব্যয় করিয়া জ্ঞানের প্রসার করিবার ইচ্ছাও তেমন ছিল না।

মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনে এই সমস্ত অভাব-অসুবিধা সকলই এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। সোণার কাঠির স্পর্শে রূপ-কথার ঘুমন্ত রাজ-কন্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘুমন্ত রাজপুরী যেমন এক নিমিষে শতবর্ষের ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনে তেমনি মানবের এতদিনের ঘুমন্ত বিদ্যার্জ্জনের স্পৃহা এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল;—এবং সেই হইতেই মানবের কর্ম্ম-জীবনে যে চঞ্চলতার তরঙ্গ উঠিল, তাহা শুধু বিদ্যার প্রসারেই সীমাবদ্ধ রহিল না,—পরন্তু, কি ব্যক্তিগত, কি রাষ্ট্রনৈতিক, সমস্ত

কার্য্যের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাচীন কার্য্যের ধারা একেবারে উল্টাইয়া দিল।

ঠিক যে কি ঘটনা বা কারণ হইতে মানুষের মাথায় ছাপিবার যন্ত্রের কল্পনা উদয় হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে মানুষকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাই দূর করিবার কোনও এক চেষ্টায় ফলে যে ইহার উদ্ভাবন হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিরকালই দেখা যাইতেছে যে, মানুষ যখনই কোন কিছুর অভাবে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছে, তখনই সেই অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাইবার একটা না একটা সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বাধাকে অতিক্রম করিবার এ চেষ্টা, এ উদ্যম, এ আগ্রহ যদি মানুষের না থাকিত, তবে আজ মানুষ কখনই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হইতে পারিত না— প্রকৃতির উপর ইচ্ছামত কর্ত্তৃত্বও করিতে পারিত না।

মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াই কি মানুষ বিরত হইল? যখন কোনও লেখার অল্প কয়েকখানি

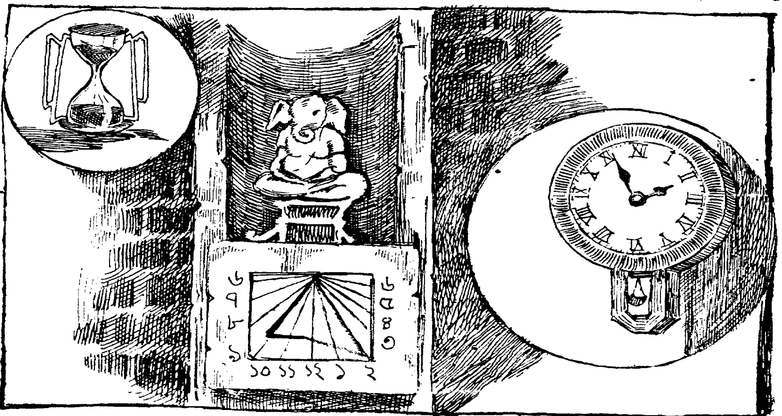
মাত্র সুন্দর ঝক্‌ঝকে নকল আবশ্যক হয়, তখন উহা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ছাপাইয়া লইতে অনেক খরচ পড়ে—এবং সময়েরও যথেষ্ট অপব্যবহার হয়। এই অসুবিধা ভোগ করিবামাত্র মানুষ অমনি "টাইপ-রাইটার" আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে প্রাত্যহিক কার্য্যাদি ;. বাণিজ্যবিষয়ক বা শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় লিখন কার্য্য কেমন সুন্দরভাবে ও স্বল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন করিতেছে।

এতদিন বাঙ্গালা "টাইপ-রাইটার" ছিল না ;—কিন্তু সেদিন কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে শান্তি-মেলায় তোমরা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে যে "রেমিংটন কোম্পানী" বাঙ্গালা টাইপ-রাইটারও তৈয়ার করিয়াছে ;—অবশ্য তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। কিন্তু ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বাবু যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই উপায়ে বাঙ্গালা "টাইপ-রাইটার" যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে, তাহা-দ্বারা বাঙ্গালা লিখন সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইবে আশা করা যাইতে পারে।

৩। ঘড়ি।

আদিমকাল হইতে মানুষ যে কেমন করিয়া অসুবিধাকে একটীর পর একটী করিয়া বিদূরিত করিয়াছে—প্রকৃতিকে কেমন করিয়া ক্রমে জয় করিয়াছে—প্রকৃতিকে কেমন করিয়া একটীর পর আর একটী শৃঙ্খলে ক্রমাগতই বাঁধিয়া বাঁধিয়া এখন একেবারে তাহার প্রভু হইয়া বসিয়াছে, ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

সমস্ত দিনটাকে কতকগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া সময়টাকে মাপিবার একটা প্রয়োজনীয়তা মানুষ স্মরণাতীত যুগ হইতেই অনুভব করিয়াছে—এবং সে অভাব দূর করিতে চেষ্টারও কোন ত্রুটি করে নাই। মানব-সভ্যতার কোন্ শৈশবকালে জানিনা মানব লক্ষ্য করিল যে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া ঠিক সমান গতিতে সমস্ত আকাশটী পরিভ্রমণ



১। বালি-ঘড়ি। ২। সূর্য্য-ঘড়ি। ৩। আধুনিক ঘড়ি।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে—পৃঃ ৩৭।

করিয়া দিন শেষে আবার পশ্চিম-আকাশের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়। অমনি মানব সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান লক্ষ্য করিয়া সময়ের পরিমাণ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্য আকাশে ঠিক কতখানি উঠিয়াছে, আন্দাজে তাহা নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব;—তাই ক্রমে সূর্য্য-ঘড়ির সৃষ্টি হইল। প্রাচীন মান-মন্দিরসমূহে এই সূর্য্য-ঘড়ির (Sun dial) সাহায্যেই সময় নিরূপিত হইত।

ইহার পরে মানুষ সময় মাপিবার জন্য এক নূতন অথচ সহজ যন্ত্র আবিষ্কার করিল। সে যন্ত্রটীকে "বালি-ঘড়ি" বলা চলে। যন্ত্রটী মোটামুটি এই—একটী কাঁচের পাত্রের মাঝখানটী অত্যন্ত সরু করা হয়—সরু মাঝটার উপরের দিকটাতে বালির গুঁড়া থাকে—নীচেরটীতে কিছু থাকে না;—সেই সরু ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়া অবিশ্রাম সমানভাবে ঝির ঝির করিয়া অল্প অল্প বালি পাত্রের নিম্নভাগে পড়িতে থাকে;—কতখানি বালি পড়িল তাহা দেখিয়া ঠিক করা হয় কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হইল।

বিজ্ঞানের দান।

সূর্য্য-ঘড়ি বা বালি-ঘড়ির প্রচলন আজকাল উঠিয়া গিয়াছে ;—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সময় মাপিবার উহা অপেক্ষা উন্নততর এবং সুবিধাজনক উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। স্প্রীংয়ের ঘড়ি এখন প্রায় ঘরে ঘরে,—রিষ্ট্ ওয়াচ এখন প্রায় প্রত্যেক যুবকের হাতে হাতে,—অনেক স্থলে আবার ইলেকট্রিক ঘড়িরও ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

এই যে স্প্রীংএর ঘড়ি,—দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, ক্রমাগতই কেবল টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া চলিতে থাকে,—আর তাহার দোলকটা (Pendulum) একবার এদিক আর একবার ওদিক দুলিতে থাকে, তাহার কল্পনা মানুষের মস্তিষ্কে কি প্রকারে উদিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গেলিলিওর কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি ;—সেই যে যাঁহাকে অবশেষে জেলে যাইতে হইয়াছিল। সেই গেলিলিও একদিন গির্জ্জায় উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন ;

গির্জ্জার চূড়ায় একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান থাকিত। গেলিলিও গির্জ্জায় থাকিতে থাকিতে ঘণ্টাটী একবার বাজান হইয়াছিল,—সেই সময় ঘণ্টাটী দুলিতে থাকে। গেলিলিও বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিলেন যে ঘণ্টাটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এদিক ওদিক দুলিতে লাগিল, এবং একবার এদিকের সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যদিকের সীমা পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে ঘণ্টাটীর পক্ষে প্রত্যেকবারেই ঠিক সমান সময় লাগিতে লাগিল। দেখিয়াই গেলিলিওর মনে হইল, এই ব্যাপারটীকে কাজে লাগাইয়া সময় মাপিবার তো বেশ একটা সুন্দর যন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে! ঘণ্টাটীকে একবার দুলাইয়া দিলে, তাহার পর প্রত্যেকবার দুলিতে যদি ঠিক সমান সময় লাগে, তবে ঘণ্টার বদলে যে কোন ভারী জিনিসকে কোনও উচ্চ স্থান হইতে দুলাইয়া দিলেও তো তাহা প্রত্যেকবার দুলিয়া আসিতে ঠিক সমান সময় লইবে। সুতরাং যে জিনিসটাকে দুলাইয়া দেওয়া

হইল, সেটা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতবার দুলিল, ইহা গণনা করিলেই তো সময়ের একটা পরিমাণ পাওয়া যায়। গেলিলিও যন্ত্র-নির্ম্মাণে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু এইরূপ দোলক-যন্ত্রের এই অসুবিধা হইল যে, দোলকটীকে একবার দুলাইয়া দিলেই তাহা বরাবর দুলিতে থাকে না;—হাওয়ায় বাধা পাইয়া দোলকের গতি প্রতিবার একটু একটু করিয়া কমিতে কমিতে অবশেষে একেবারে স্থির হইয়া যায়। সুতরাং যাহাতে একবারমাত্র দুলাইয়া দিলেই বরাবর দোলকটী সমান বেগে দুলিতে থাকে তাহার একটা উপায় আবিষ্কার করা আবশ্যক হইল। তখন স্প্রীংএর প্রচলন হইল;—এইরূপে বর্ত্তমান কালের ঘড়ির সৃষ্টি হইয়াছে।

(খ) প্রকৃতির দাসত্ব।

বিনা খরচায় কল-চালান।

বুদ্ধিমানের লক্ষণই হইতেছে নাকি "পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা"—অর্থাৎ পরকে যে যত খাটাইয়া, তাহার দ্বারা কাজ আদায় করিয়া লইতে পারিবে, লোকে তাহারই তত তারিফ করিবে। এ বিষয়ে মানুষ কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ঘোড়া, গরু, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি পশুকে তো সে আগে হইতেই নিজের দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছে; তাহা ছাড়া জড় জগৎ হইতেও নিজের দাবী পুরাদস্তুর আদায় করিয়া লইতে সে কিছুমাত্র ত্রুটী করে নাই। পৃথিবীকে কর্ষণ করিয়া তাহা হইতে শস্য উৎপাদন করিয়াছে—নদী এবং সমুদ্রের জল লইয়া তাহা দ্বারা রন্ধন, স্নান পান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে,—মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে,—

বিজ্ঞানের দান।

নিশ্বাসের সহিত বায়ুকে গ্রহণ করিয়া, শরীরের রক্ত চলাচল অব্যাহত রাখিয়াছে,—এক কথায় জগতের সকল বস্তু হইতেই সে কিছু না কিছু শুল্ক আদায় করিয়াছে। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত মানুষ প্রকৃতির দুইটা অত্যন্ত মোটা শক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করে নাই।

মানবের প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় নানা প্রকার দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য মানবকে নানাপ্রকার কল চালাইতে হয় তাহার জন্য শক্তির আবশ্যক। কয়লা পুড়াইয়া যে উত্তাপ পাওয়া যায়, সেই উত্তাপের শক্তির দ্বারা অবশ্য কল চালান যায়, এবং তাহা হইয়াও থাকে; কিন্তু তাহাতে একদিকে যেমন অনেকখানি কয়লা পুড়িয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি সেই কয়লারাশি সংগ্রহ করিতে খরচের অন্ত থাকে না। অথচ মানুষের চক্ষের উপর দিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে নদীর স্রোত অবিশ্রান্ত সবেগে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে, বায়ুর স্রোত অক্লান্তভাবে পৃথিবীর উপর দিয়া



জল-স্রোত চালিত কল।

বিজ্ঞান চিত্রে [illegible] পৃ: ৭৯।

বহিয়া যাইতেছে;—কতদিন পর্য্যন্ত কেহ তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে নাই।

ইহার পরে হঠাৎ যখন একদিন মানব খেয়াল করিল যে প্রকৃতির এই দুইটি প্রকাণ্ড শক্তির উৎস, মানবকে কোনই শুল্ক প্রদান না করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বহিয়া যাইতেছে, অথচ তাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কর আদায় করা যাইতে পারে, তখনই মানব উপায় ভাবিতে লাগিয়া গেল, কি প্রকারে এই দুই শক্তিকে কাজে লাগাইবে। মানব স্থির করিল, নদীর স্রোত এবং বায়ুর স্রোতের সাহায্যে কল চালাইবে, এবং কয়লার খরচ বাঁচাইবে। যেমন ভাবা অমনি কাজ; নদী এবং জলস্রোতের ধারে মানব জলস্রোত-চালিত কল নির্ম্মাণ করিল; নানাস্থানে বায়ুস্রোত-চালিত (Wind-mill) কলও তৈয়ার হইল। জলস্রোত-চালিত কলে সাধারণতঃ একটা প্রকাণ্ড চাকা জলস্রোতের মধ্যে ঈষৎ ডুবান থাকে; জলের স্রোত চাকাটাকে কেবলই ঘুরাইয়া থাকে, এবং

বিজ্ঞানের দান।

সেই ঘূর্ণ্যমান চাকার সহিত আভ্যন্তরীণ কলের সংযোগ করিয়া কল চালান হয়। বায়ু-স্রোত-চালিত কলে, ইলেকট্রিক পাখার মত একটা লোহার দণ্ডের চারিধারে কতকগুলা বৃহৎ পাখা থাকে (ছবি দেখ); বায়ুর স্রোত লাগিয়া সেই পাখাগুলি যখন ঘুরিতে থাকে, তখন সেই পাখাগুলির দণ্ডটীর সহিত আভ্যন্তরীণ কলের সংযোগ করিয়া কল চালান হয়।

আজ পৃথিবীতে জল-স্রোত-চালিত কল যে, কত সৃষ্ট হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। বায়ুচালিত-কলের সংখ্যা খুব বেশী নাই, কারণ বায়ুস্রোতের গতি সারা বৎসর ঠিক সমান থাকে না। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই—বিশেষতঃ নদী অথবা জলপ্রপাত-বহুল-দেশ সমূহে—জল-স্রোতের সাহায্যে কল চালান এখন প্রাত্যহিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জলস্রোতের সাহায্যে মানুষ আজকাল আবার বৈদ্যুতিক শক্তিরও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্ব-



বায়ু চালিত কল।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে— পৃঃ ৮০

বিজ্ঞানের দান।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন যে, যদি একখণ্ড-চুম্বককে ক্রমাগত ইতস্ততঃ সঞ্চালন করা যায়—তবে তাহার চারিদিকে তড়িৎ-তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। সেই আবিষ্কারকে ভিত্তি করিয়া মানুষ এখন জল-স্রোতের সাহায্যে চুম্বককে ক্রমাগত সঞ্চালন করিবার উপায় বাহির করিয়াছে, এবং তাহা দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি করিতেছে। তোমরা হয়ত শুনিয়া সুখী হইবে যে, জলস্রোতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি করিবার এইরূপ একটী কল ভারতবর্ষেও নির্ম্মিত হইয়াছে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী টাটা কোম্পানী এই কলটীর মালিক।

(গ) রাসায়নিকের দান।

১। এক পয়সার দিয়াশালাই।

একটী পয়সার দিয়াশলাই কিনিয়া তোমরা আজ উনান ধরান, আলো জ্বালা প্রভৃতি যত প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে, সমস্তই সমাধা করিতেছ, কিন্তু তোমরা কখন কি একবারও ভাবিয়া থাক যে কত বৈজ্ঞানিকের কত চেষ্টার ফলে তোমরা আজ এই সুবিধা উপভোগ করিতেছ ?

আগুন না হইলে মানুষের একদিনও চলে না, কিন্তু এই আগুন জ্বালাইতে দিয়াশলাইয়ের মত একটা সোজা উপায় বিজ্ঞান যদি আবিষ্কার করিয়া না দিত, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দাশাটা যে কি হইত, তাহা বোধ হয় বেশ বুঝিতেছ।

আদিম যুগের মানুষ অগ্নি উৎপাদন করিত দুই টুকরা কাষ্ঠের সংঘর্ষণে। যে কোনও দুইটী জিনিস পরস্পর ঘর্ষণ করিলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়,

এবং দুই খণ্ড কাষ্ঠকে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে থাকিলে কাষ্ঠ দুইটি যে ক্রমাগত উত্তপ্ত হইতে হইতে শেষে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে, যখন পুনরায় ঘর্ষণ মাত্র একটী কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠে, এ তথ্য মানুষ সেই আদিম যুগেই আবিষ্কার করিয়াছিল।

কিন্তু এইরূপে দুইটী কাষ্ঠের ঘর্ষণ-দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা যে কতদূর শ্রম সাধ্য এবং তাহাতে যে কতখানি সময়ের অপব্যয় হইত, তাহা প্রাচীন কালের লোকেরা মর্ম্মে, মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল। তাই যাহাতে বার বার অগ্নি জ্বালিবার ক্লেশ মানুষকে সহ্য করিতে না হয়, সে জন্য মানুষ একবার অগ্নি জ্বালিতে পারিলে আর তাহা নিবাইত না; শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভৃতি নানারূপ খোরাক জোগাইয়া সর্ব্বদাই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া রাখিত। রোম নগরে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিবার জন্য একটী মন্দিরই নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেকগুলি কুমারী সেই মন্দিরে অগ্নি-দেবতার সেবিকা নিযুক্তা থাকিতেন। সমস্ত রোমবাসী সেই মন্দির-মধ্যস্থ

বিজ্ঞানের দান।

অগ্নিকে এবং তাহার সেবিকাগণকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। আমাদের দেশেও পূজার সময় অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার প্রথা আছে।

ইহার পরের যুগে মানুষ চকমকি পাথর ঠুকিয়া আগুন বাহির করিতে শিখিল; কিন্তু সেই উপায়ে আগুন বাহির করিতেও মানুষের কষ্টের অবধি থাকিত না। চকমকির ঘর্ষণে মুহূর্ত্তের জন্য যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তাহারই সাহায্যে শুক্‌না নারিকেলের ছোবড়া অথবা শোলার টুকরা অতি কষ্টে জ্বালান হইত, এবং সেই আগুন তখন দিয়া-শলাইয়ের মত ব্যবহার করাই রীতি ছিল।

এই সেদিনও আমাদের বাঙ্গালা দেশের বাড়ীতে বাড়ীতে দিন-রাত তুষের আগুন জ্বালিয়া রাখা হইত; কেন না, একবার আগুন নিবিয়া গেলে, পুনরায় তাহা জ্বালিতে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইত। অসুবিধার সীমা ছিল না। এমন অনেক সময় আসিত, যখন প্রতিবেশীর গৃহ হইতে আগুন আনা ছাড়া উপায় থাকিত না।

বিজ্ঞান যে এখন তোমাদিগকে ঐ সমস্ত অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি দিয়াছে, তাহার জন্য বিজ্ঞানের নিকট তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সহজে দাহ্য ফসফরাস্ (Phosphorus) নামক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান তাহার সাহায্যে দিয়াশলাই প্রস্তুত করিয়া তোমাকে অগ্নি-উৎপাদনের সহজ উপায় প্রদান করিয়াছে। একটী পয়সার দিয়াশলাইকে সামান্য একটী পয়সা দাম বলিয়াই তোমরা অনেক সময় তাচ্ছিল্য করিয়া থাক,—কিন্তু মনে রাখিও এই একটী পয়সার দিয়াশলাই যদি না থাকিত, তবে আজ তোমাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না।

২। ডিনামাইট।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাইবার পর হইতে, নোবেল সাহেবের নামের সহিত অনেক বাঙ্গালীই পরিচিত। ডিনামাইট প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া নোবেল সাহেব বিখ্যাত হইয়াছেন। ডিনামাইট জিনিসটা যে কি দিয়া প্রস্তুত, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। নাইট্রো-গ্লিসারিণ (nitro glycerine) নামক এক প্রকার অত্যন্ত বিস্ফোরক পদার্থের সন্ধান রাসায়নিক কিছুকাল পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। এই নাইট্রো-গ্লিসারিণ পদার্থটী এত বেশী বিস্ফোরক যে, ইহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে না রাখিতে অমনি সশব্দে জ্বলিয়া উঠে। সুইডেনবাসী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল সাহেব, সাংঘাতিক স্ফোটন-ধর্ম্মী নাইট্রো গ্লিসারিণ পদার্থটীকে মাটীর সহিত মিশাইয়া দিয়া এমন একটী পদার্থ সৃষ্টি করিলেন,

যাহা বিস্ফুরিকা শক্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী হইলেও তাহা দ্বারা সমূহ বিপদের আশা নাই। এই পদার্থটীর তিনি নাম দিলেন ডিনামাইট।

এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া মানুষকে যে প্রচণ্ড শক্তির সন্ধান দিয়াছেন, আজ মানুষ তাহার বলে বলীয়ান হইয়া প্রাকৃতিক কোন বাধাকেই আর বাধা বলিয়া মানিতেছে না। পর্ব্বত উড়াইয়া দিয়া মানু সমভূমি তৈয়ার করিতেছে—সমুদ্র-মধ্যস্থিত জল-মগ্ন পাহাড়কে ইহার সাহায্যে উড়াইয়া দিয়া মানুষ জাহাজ-যাতাযাতের পথ বাধাশূন্য করিতেছে—এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য-বিস্তারে মানুষ আজ সমর্থ হইয়াছে।

বাস্তবিক পার্থিব সর্ব্বপ্রকার শক্তিকে বাঁধিয়া মানুষ যে কি প্রকারে তাহাকে আপনার কাজে লাগাইতেছে— ক্রীতদাসের মত তাহাকে ইচ্ছামত খাটাইয়া লইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

বিজ্ঞানের দান।

বিজ্ঞান যেন মানুষের নিকট এক মোহময় স্বপ্ন-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—সেখানে শুধু মানুষই রাজা; আর সেই মানুষ-রাজাকে ঘিরিয়া প্রচণ্ড শক্তিশালী শত শত ভৃত্য সর্ব্বদা করজোড়ে আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে; একটী-মাত্র মুখের আদেশ পাইলেই, সামান্য একটী মাত্র হস্তের ইঙ্গিতে তাহারা যাইয়া অসাধ্য সাধন করিবে—এমনি একটা ভাব! আলাদিনের প্রদীপটা যেন বিজ্ঞান আবার মনুষকে ফিরাইয়া দিয়াছে, আর মানুষ সেই প্রদীপটী হাতে পাইয়া প্রদীপের ভৃত্য দৈত্যটীকে ইচ্ছামত ফরমাইস্ করিতেছে—আর সেও তাহা বিনা প্রতিবাদে তখনি পালন করিতেছে।

৩। আলো জ্বালান।

দিন ফুরাইলে রাত্রি হইবে, এবং রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর মানুষ একটু বিশ্রাম করিবে, এইটাই ছিল ভগবানের মতলব, এবং সে মতলব যে তিনি আজও ত্যাগ করেন নাই, তার বিশিষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ঠিক সন্ধ্যার সময় তাঁহার সূর্য্য-প্রদীপটি তিনি নিবাইয়া দেন, আর ভোরের আগে শত কান্নাকাটিতেও সে সূর্য্য-দীপ আর জ্বালেন না। মানুষ কিন্তু এরূপ জোর-জবরদস্তিতে ভারী চটিয়া গেল। সেই আদিকাল হইতে মানুষের চেষ্টা হইল কি করিয়া আলো জ্বালিয়া রাত্রে কাজ করিতে পারে।

দাবাগ্নি হইতে মানুষ যখন প্রথম আলোকের সন্ধান পাইল, তখনই তাহাদের মাথায় গিয়াছিল কি করিয়া এই আলোকের সাহায্যে তাহারা দিবা-রাত্রি কাজ করিতে পারে। শেষকালে তাহারা স্থির করিল অনেক কাঠ একস্থানে জড় করিয়া

বিজ্ঞানের দান।

আগুন লাগাইয়া দিয়া তাহার চারিদিকে বসিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তি একসঙ্গে কাজ করিবে। কিন্তু পরিশ্রম যে এতে বেজায় বেশী—মজুরী মোটেই পোষায় না। একে ত কতই কষ্ট করিয়া কাষ্ঠ জোগাড় করিতে হইবে, তাহার পর এত করিয়াও ঘরে ঘরে আলো পাওয়া যাইবে না, দশ বাড়ীর লোক একত্র হইয়া তবে কাজ করিতে পারিবে। মানুষ আবার একটা উপায় স্থির করিবার জন্য লাগিয়া গেল। এবার যে উপায় স্থির করিল। তাহার জন্য যদিও তাহারা নোবেল প্রাইজ পায় নাই, তথাপি সেটা যে কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহাতে কোনও ভুল নাই; সে উপায় হইতেছে জন্তুর চর্ব্বি ও ঘৃত দ্বারা আগুন জ্বালান। পুরা-কালের ঋষিরা এই আগুন জ্বালান ব্যাপারটিকে বড়ই শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। ঘৃত-দ্বারা হোম না করিলে কোন বৈদিক কার্য্যই হইত না। ক্রমে মানুষ অবিষ্কার করিল রেড়ীর তৈল, সরিষার তৈল প্রভৃতি উদ্ভিদজাত তৈলই আলো জ্বালানর

পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সে বিশ্বাস আজও অনেক-স্থলে অপনীত হয় নাই। কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম্ প্রভৃতি খনিজ তৈলের অস্তিত্ব এই সেদিনও মানুষ জানিত না। খনিজ তৈলের উপকারিতা মানুষ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না করিতেই গ্যাসের প্রবর্ত্তন হইল; এবং গ্যাসের আলো এই সেদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত বড় বড়, সহর যে শুধু আলোকিত করিয়াছে, তাহা নহে, সূর্য্যের সঙ্গে টেক্কা দিয়া জ্বলিয়াছে।

আলোর সেই গিয়াছে এক যুগ, আর আজ ইলেক্ট্রিকের প্রভাবে আসিয়াছে আর এক যুগ। কোন রকম চকমকি বা দিয়াশলাইয়ের সাহায্য ব্যতীতও যে আলো জ্বলিতে পারে, এ কথা কয়েক বৎসর আগে নিতান্ত বাতুলের মুখেও শোভা পাইত না। একটি বোতাম টিপিলেই যে সিকি মাইল পর্য্যন্ত পথ আলোকে আলোকিত হইয়া যায়, এটা যে প্রকৃতির কত বড় একটা পরাভব, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না

এই ইলেক্‌ট্রিক আলো আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে ইহার নিকট অন্য সব প্রকার আলোর পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে;—কেবল রাসায়নিকের আবিষ্কৃত গ্যাসের আলো পদার্থ-বিদের আবিষ্কৃত এই বৈদ্যুতিক আলোর সহিত বরাবরই টেক্কা দিয়া আসিতেছে। এই দুইটী প্রকার আলোর মধ্যে ঔজ্জ্বল্য কাহার বেশী, তাহা আজও মীমাংসিত হয় নাই। ইলেক্‌ট্রিক আলোর ঔজ্জ্বল্য যে কত বেশী, তাহা তোমরা যে কোনও রেল-ষ্টেসনে দেখিয়া থাকিবে; কিন্তু দ্যুতিতে গ্যাসের আলোও যে বড় কম যায় না, তাহা তোমরা বিবাহ-বাড়ী ইত্যাদিতে প্রকাণ্ড গ্যাসের "সূর্য্য-আলো" সকল দেখিয়া বুঝিতে পারিবে। সুদূর ভবিষ্যতে এই জয়-পরাজয়ের মীমাংসার সময় এতদুভয়ের মধ্যে কে যে জিতিবে, তাহা আজও বলা যায় না।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাত্রির অলসতা মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল; আর আজ

বিজ্ঞানের দান।

মানুষ অন্ধকারকে গ্রাহ্যই করে না। সন্তানগণের উদ্যমের নিকট তাঁহার স্বীয় প্রয়াস ব্যর্থ দেখিয়া ভগবানের হৃদয় নিশ্চয়ই বাৎসল্য রসে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে।

(ঘ) আলোর খেলা।

১। বায়স্কোপের গল্প।

বায়স্কোপ (ছায়াচিত্র) জিনিসটা আজকাল ছেলে বুড়ো সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে।

ছবি জীবন্ত মানুষের মতই হাত পা নাড়িতেছে, লাফাইতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, মোটর চালাইতেছে,—এক কথা কহা ছাড়া আর সর্ব্বপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছে। ইহা দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়?

কিন্তু এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটি মানুষ কি করিয়া সম্ভব করিয়াছে জান?

আলোর পাশে দাঁড়াইলে, ঘরের দেওয়ালে, মানুষের যে ছায়া পড়ে, তাহা দেখিতে ঠিক সেই ব্যক্তির মত। শুধু মানুষের কেন—আলোর পার্শ্বে মানুষের বদলে যে কোনও জিনিসই রাখা

যাউক না কেন ঠিক তাহারই ছায়া দেওয়ালের উপর পড়িবে। ইহা হইতে ম্যাজিক লণ্ঠনের সৃষ্টি।

কিন্তু দেওয়ালের উপর যদি কোনও ছায়া এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের একভাগ সময়ের চেয়েও কম সময়ের জন্য পড়ে, তবে সেই ছায়া আমরা চোখে দেখিতে পাই না।

তেমনি তুইটী ছায়া দেওয়ালে ফেলিবার মধ্যে যদি ঐ সময়টুকু ফাঁক যায়, তবে তাহাও আমরা ধরিতে পারি না; মনে করি তুইটী ছায়াই বুঝি এক।

এই ব্যাপারের উপর বায়স্কোপের মূল প্রতিষ্ঠিত।

ক্রম-পরিবর্ত্তিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কতকগুলি চিত্রের ছায়া পর পর চক্ষের উপর দিয়া অতি দ্রুত ভাসিয়া যাইতে থাকে; কাজেই মাঝের ফাঁকটুকু চোখে পড়ে না;—মনে হয় একই ছবি কেবল অবস্থা (Posture) বদলাইতেছে। চোখের ধাঁধায় অচল ছবি সচল হইয়া উঠে।

বিজ্ঞানের দান।

এই বায়স্কোপ জিনিসটা মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তির এক অতি আশ্চর্য্য পরিচয়। বাস্তবিক অতি সামান্য সাধারণ বিষয় সমূহ হইতে বৈজ্ঞানিক যে কত জটিল আশ্চর্য্য বিষয়ের উদ্ভাবন করিয়া, মানবকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ প্রদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

আলো ও ছায়ার খেলা তো মানুষ প্রত্যহই দেখিয়া আসিতেছে। সেই সত্যযুগ হইতেই তো প্রত্যহ একবার করিয়া সূর্য্য আকাশে উঠিতেছে আর প্রত্যহই তাহার আলোতে মানুষ আর কিছুর না হউক, অন্ততঃ নিজের ছায়াটাকেও দেখিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই আলো ও ছায়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া, তাহারই একটা প্রয়োগের দ্বারা বায়স্কোপের মত এমন একটা আশ্চর্য্য জিনিস উদ্ভাবন করিতে কত বড় একটী বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কের আবশ্যক হইয়াছিল।

যেদিন হইতে মানুষ ফটোগ্রাফের আবিষ্কার করিল—কাগজের উপর মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কোনও

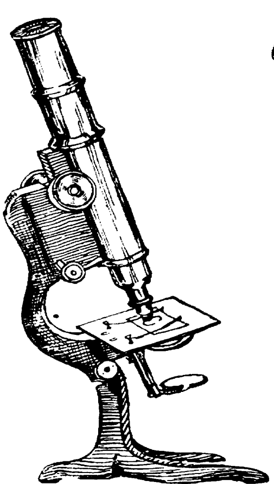
বস্তুর অবিকল প্রতিকৃতি উদ্ধৃত করিতে শিখিল, সেই দিন হইতেই তাহার উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা সেই নির্জীব প্রতিকৃতিকে সজীব দেখিতে উন্মুখ হইয়াছিল। ছবি সচল হইয়া নড়িয়া বেড়াইবে; প্রাণবানের ন্যায় কথা বলিবে, ইহাই হইয়াছিল তখন বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য।

সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানবের যখনই যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, যখনই যাহা অভাব হইয়াছে, তখনই নাকি মানব সে ইচ্ছা—সে অভাব পূরণ করিবার উপায় বাহির করিয়া আসিয়াছে;—তাই তাহার আকাঙ্ক্ষারও যেমন অন্ত ছিল না, তাহার দুরাশারও তেমনি শেষ ছিল না। তাই নির্জীব ছবিকে সজীব দেখাও অসম্ভব মনে করিল না।

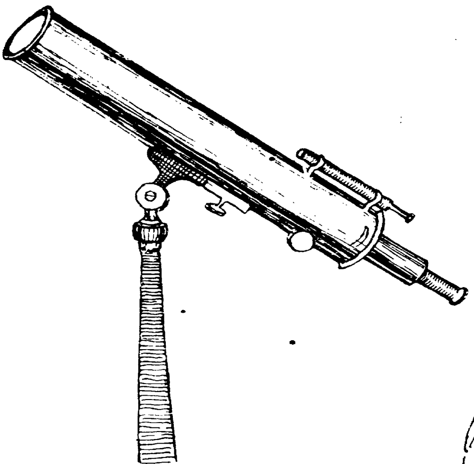
অপরিমেয় উদ্যম লইয়া—তন্ন তন্ন করিয়া আলো ও ছায়ার সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া, বৈজ্ঞানিক অবশেষে অচল ছবিকে সত্যই সচল করিতে পারিল;—কিন্তু তখনই কথা বলাইতে পারিল না। এইরূপে বায়স্কোপের সৃষ্টি হইল।

বিজ্ঞানের দান।

মূক-চিত্রকে মানুষ আজও কথা বলাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু মানুষ সে বিষয়ে একেবারে নিরাশ হয় নাই। কে বলিতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে একদিন মূক-চিত্রের মুখে কথা ফুটিবে না? অনন্ত সময় সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, মানবের উদ্যম অসীম—নিত্য নূতন আবিষ্কারের জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে। এ দুইয়ের সংযোগে কি যে না হইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া নির্ণয় করা কঠিন।



ম স্কোপ



টেলিস্কোপ



২। দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র

মানুষের দৃষ্টি-শক্তি সীমাবদ্ধ। তাই মানুষ অনাবৃত স্থূল চক্ষে একদিকে যেমন বায়ুমণ্ডল-মধ্যস্থ এবং পার্থিব যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির আহার, বিহার, হস্ত-পদাদি-সঞ্চালন, গঠন-প্রণালী এমন কি অনেক সময়ে অস্তিত্ব পর্য্যন্তই দেখিতে পায় না, অন্যদিকে তেমনি তীব্র দৃষ্টি-শক্তির অভাবে নভোমণ্ডলস্থ অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি তাহার চক্ষেই পড়ে না। মানুষ স্থূলচক্ষে যতটুকু দেখিতেছে, শুনিতেছে, অনুভব করিতেছে, তাহাই লইয়া গবেষণা করিয়া তাহারই সর্ব্বথা উন্নতি সাধন করিয়া বিশ্বজগতের সম্মুখে আপনার গৌরব এবং প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। কিন্তু ধরিতে গেলে, মানুষ দেখিতেছে কতটুকু? মানবের স্থূলদৃষ্টির বাহিরে এই যে অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদির রাজ্য এবং এই যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অসংখ্য কীটাণু-

দের অসীম রাজ্য অনাবিষ্কৃত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে মানব যদি কোনও সংবাদই রাখিতে না পারিল ;—সে সব রাজ্য কি প্রকার, সেখানে জীব জড়ের অবস্থা কি প্রকার, তাহার কিছুই যদি মানব দেখিতে, শুনিতে বা অনুভব করিতে না পারিল,—তবে আর মানবের গৌরব বজায় রহিল কোথায় ?

মানব স্বীয় দৃষ্টি-শক্তির এই হীনতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইল। অদম্য উদ্যমে দৃষ্টিশক্তির পরিধি বিস্তার করিবার উপায় উদ্ভাবনে লাগিয়া গেল। অবশেষে কতকগুলি কাঁচখণ্ডকে ঈষৎ বৃত্তাকারে কাটিয়া, তাহাদিগকে যথাস্থানে সাজাইয়া, দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিল। আজ মানুষ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একদিকে যেমন কত অজানা, অনাবিষ্কৃত গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছে—পৃথিবীতে বসিয়া সুদূর গগনে অবস্থিত চন্দ্রমণ্ডলের নদ-নদী ও পর্ব্বতের সংখ্যা, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় নির্ণয় করি-

তেছে,—অন্যদিকে তেমনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজাণু প্রভৃতির সামান্য অঙ্গভঙ্গীটি পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইতেছে। জীব-দেহের অতি সূক্ষ্ম অংশটী পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে আজ সে সমর্থ; চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া জীব-জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে আজ সে বদ্ধপরিকর।

(ঙ) বিদ্যুতের খেলা।

১। ইলেক্‌ট্রিক পাখা ও আলো

বিদ্যুতের অস্তিত্বের সন্ধান মানুষ বহুকাল আগেই পাইয়াছে, কিন্তু সে বিদ্যুতকে তামার তারে বাঁধিয়া তাহাকে মানুষের কাজে লাগাইবার কোনও উপায় মানুষ অনেক দিন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। এক খণ্ড কাঁচকে যদি এক টুকরা সিল্কের (রেশমের) দ্বারা ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হুইলে যে সেই কাঁচখণ্ডে এবং সিল্কের টুকরায় বিদ্যুতের উদ্ভব হয়, তাহা মানুষ অনেক আগেই দেখিয়াছিল; কিন্তু সে বিদ্যুতের দ্বারা কোনও প্রকার কার্য্য সমাধা করা মানুষের সাধ্যে কুলায় নাই। কারণ, এই উপায়ে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণও যেমন খুব বেশী নয়, তাহা তৈয়ার করিতে খরচও তেমনি খুব বেশী পড়ে। তাই যত

দিন পর্য্যন্ত না চুম্বকের সহিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের যথাযথ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া মানুষ অল্প খরচায় তড়িৎ-উৎপাদনের উপায় শিখিল, ততদিন পর্য্যন্ত তড়িৎকে কল চালান, আলো জ্বালান, পাখা ঘুরান, রন্ধন প্রভৃতি বড় বড় কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

আজ তোমরা যেদিকে চাও, সেইদিকেই বিদ্যুতের খেলা দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের হাওয়া করিবার পাখা বিদ্যুতে চলিতেছে, তোমাদের ঘরের আলো বিদ্যুতের জোরে জ্বলিতেছে, যে ট্রাম গাড়ীতে করিয়া তোমরা বেড়াইয়া থাক, যে টেলিগ্রাম, টেলিফোন আজ তোমাদের সর্ব্বপ্রকার সংবাদ বহন করিতেছে, সে সমস্তই বিদ্যুতের জোরে চলিতেছে।

কিন্তু এইরূপে আকাশের বিদ্যুৎকে তামার তারে বাঁধিয়া তাহাকে মানবের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিবার পথ প্রথমে কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, জান ?

চুম্বক তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, চুম্বকের নিকট

বিজ্ঞানের দান।

লোহার কোনও জিনিস রাখিলে চুম্বক যে কেমন করিয়া সেই লোহাকে আকর্ষণ করে, তাহাও তোমরা জান। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে একদিন তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে একটী চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে, উভয়-প্রান্ত একত্র সংযোজিত এক খণ্ড তামার তারের নিকট যদি এক খণ্ড চুম্বক আনয়ন করা যায়, তবে মুহূর্ত্তের জন্য সেই তামার তারে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। চুম্বকটীকে সেই তামার তারের নিকটে আনয়ন করার পর, যদি চুম্বকটী আবার তামার তারটী হইতে দূরে লইয়া যাওয়া হয়, তবে সেই তামার তারে পুনরায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ইহার পর ফ্যারাডে দেখিলেন যে চুম্বকটীকে তামার তারটীর দিকে অগ্রসর করাইবার বা তারটী হইতে দূরে অপসারিত করিবার সময়েই যে শুধু তারটীতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা নহে, সেই তামার তারটীর সম্মুখে চুম্বকটীকে সামান্য মাত্র সঞ্চালন করিলেই, তারটীতে বিদ্যুতের সঞ্চার হয়।

এই তথ্যটী আবিষ্কার করিয়া ফ্যারাডে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন;—তিনি বুঝিলেন যে এক দিন চুম্বকের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করিবার এই শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ জগতে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিবে। এ কথা তিনি তখন নিঃসন্দেহ বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সময়কার সকল লোকে ব্যাপারটীকে ঠিক সে ভাবে বুঝে নাই। ফ্যারাডে যখন বিলাতের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহার সেই আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণিত করিলেন, তখন সেই সমবেত জন-মণ্ডলীর চিত্তে ইহার জন্য বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হয় নাই।

এমন কি সেই সভায় উপস্থিত একজন ভদ্র মহিলা ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, এই রূপে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের যে সৃষ্টি হয়, তাহা যেন বুঝিলাম,—কিন্তু তাহাতে ফল হইবে কি?" ফ্যারাডে তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন—"ভদ্রে, নবজাত শিশুর প্রয়োজনীয়তা কি, আমাকে বলিতে

পারেন ?" ভদ্র মহিলাটী তাঁহার সেই উত্তর শুনিয়া একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পরেই, ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রবীণ মন্ত্রী বিখ্যাত রাজ-নৈতিক গ্লাড্‌স্টোন ফ্যারাডেকে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটী করিলে, ফ্যারাডে তাহার উত্তরে বলিয়া-ছিলেন, "ইহার দ্বারা আর কোন কাজ হউক আর না হউক, আপনি অচিরেই এইরূপে সৃষ্ট বিদ্যুতের উপর ট্যাক্স (খাজনা) বসাইয়া ইংলণ্ডের রাজকোষ পূর্ণ করিতে পারিবেন।"

ফ্যারাডের সেই ভবিষ্যদুক্তি আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তখন যে "চুম্বক-জনিত-বিদ্যুতের শৈশব অবস্থা ছিল, আজ তাহা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাবলশালী ইলেক্‌-ট্রিক ডাইনামোতে (Electric Dynamo) পরিণত হইয়াছে; এবং সেই ডাইনামো হইতেই বিদ্যুৎ উদ্ভূত হইয়া সভ্য জগতের অর্দ্ধেক কাজ-কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য শক্তি যোগাইতেছে—সেই ডাইনামো-উদ্ভূত বিদ্যুতই তোমার ঘরের বৈদ্যুতিক

আলো জ্বালাইতেছে; তোমার ঘরের বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরাইতেছে;—তোমার বেড়াইবার ট্রাম চালাইতেছে। যত বড় বড় ব্যবসায়ী সেই ডাইনামো-উদ্ভুত বিদ্যুৎ লইয়া কারবার করিতেছে, তাহারা যে শুধু নিজেরাই বড়লোক হইতেছে, তাহা নয়, তাহাদের অনেক টাকা রাজকোষে যায়, এবং প্রকারান্তরে তাহার দ্বারা দেশের যাবতীয় লোকই উপকৃত হয়।

২। একস্-রে (X'ray)

বৈজ্ঞানিক যখনই একটা নূতন কিছু বস্তু বা শক্তির আবিষ্কার করেন, তখনই তিনি সেটাকে সর্ব্বপ্রকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়া ছাড়েন না। বিদ্যুৎ জিনিসটাকে কি প্রকারে কাজে লাগাইতে হয়, তাহা মানুষ আবিষ্কার করিল বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিসটা যে কি, তাহা লইয়া একদিন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ হইয়া গেল। সেই দলাদলির হুজুগে দুইটী দলই প্রতি-পক্ষের ধারণা যে ভুল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, এবং বিদ্যুৎ লইয়া দুই দলের পরীক্ষা চলিল।

ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া একদিন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রন্‌জেন্ (Rontgen), একটী কাঁচের গোলককে (মুখ-আঁটা ফাঁপা গোল পাত্র) প্রায় সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে লাগিলেন। একটী অন্ধকার

ঘরের মধ্যে, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তিনি উক্ত পরীক্ষা করিতেছিলেন, পার্শ্বেই বেরিয়াম্ প্লাটিনো-সায়ানাইড নামক একপ্রকার পদার্থের একটা পাত পড়িয়াছিল, হঠাৎ রন্‌জেন সাহেব বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, বেরিয়াম্ প্লাটিনো-সায়ানাইডের পাতটী তীব্র জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া সমস্ত ঘরটিকে আলোকিত করিল। কোথা হইতে যে এ আলো আসিল, তাহা তিনি কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। ঘরেতো কোন আলো জ্বলিতেছিল না; ঘরতো অন্ধকার! তবে হঠাৎ বেরিয়াম্ প্লাটিনো-সায়ানাইডের পাতটী হইতে আলো প্রতিফলিত হইতেছে কি প্রকারে? রন্‌জেন ভাবিলেন, "ওই যে বায়ুশূন্য গোলকটীর মধ্য দিয়া বিদ্যুত চালাইতেছি, ওইটী হইতেই কি আলোক-রশ্মি বহির্গত হইয়া, পাতটীর দ্বারা প্রতিফলিত হইতেছে?" রন্‌জেন গোলকটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন;—কই? তাহা হইতে ত কোনও আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে না! সন্দেহ-

নিরাকরণের জন্য তিনি সেই গোলকটীর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালান বন্ধ করিলেন, আমনি পাতটী হইতে সে আলোক-নির্গমনও বন্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি আবার গোলকের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলেন; অমনি পাতটী আবার দীপ্ত হইয়া উঠিল। আবার বিদ্যুৎ চালান বন্ধ করিলেন,—দীপ্তিও পুনরায় লোপ পাইল। তখন তিনি ঠিক করিলেন যে, যে প্রকারেই হউক বায়ুশূন্য গোলকটীর মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি অদৃশ্যভাবে নির্গত হইয়া বেরিয়াম্ প্লাটিনো-সায়ানাইড কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইতেছে; এবং সেই জন্যই বেরিয়াম্ প্লাটিনো-সায়ানাইডটী দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

এই অদৃশ্য আলোক-রশ্মির নির্গমন বন্ধ করিবার জন্য তিনি সেই গোলকটীকে কাল রংয়ের কাগজে মুড়িয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতে আলোক-নির্গমন বিন্দুমাত্রও বাধা পাইল না। সূর্য্যালোক যেমন করিয়া স্বচ্ছ কাঁচের পাতকে ভেদ করিয়া যায়, এই অদৃশ্য আলোক-রশ্মিও সেইরূপে সেই কাগজ

ভেদ করিয়া বাহির হইতে লাগিল। তখন তিনি পাতটী ও গোলকটীর মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়া দেখিলেন ফলের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। আলোক-রশ্মি পূর্ব্বেও যেমন নির্গত হইতে ছিল, কাষ্ঠখণ্ড ভেদ করিয়াও প্রায় তেমনই নির্গত হইতে লাগিল। তখন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রন্‌জেন নিজের হাতখানি সেই গোলক এবং পাতটীর মাঝে ধরিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন;—আলোকরশ্মি হস্তের চর্ম্ম প্রভৃতি অংশ ভেদ করিয়া একরূপ অবাধে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু হাড়গুলি ভেদ করিয়া বড় একটা যাইতে পারিতেছে না। তাই হস্তের মাংস, চর্ম্ম, প্রভৃতির কিছুরই ছায়া সেই বেরিয়াম প্লাটিনো-সায়ানাইডের পাতাটীর উপর বড় একটা পড়িতেছে না বটে, কিন্তু হাড়গুলির ছায়া বেশ গভীর ভাবেই পড়িতেছে।

তোমরা সকলেই জান যে, যে জিনিস স্বচ্ছ —যেমন কাঁচ তাহার উপর আলোক-রশ্মি

পড়িলে তাহার কোনও ছায়া পড়ে না—কিন্তু কোনও অস্বচ্ছ দ্রব্যের উপর আলোক-রশ্মি পড়িলে তাহার যে কি প্রকার গভীর ছায়া পড়ে, তাহা দিনের আলোয় দাঁড়াইয়া প্রত্যহই তোমরা দেখিতেছ। রন্‌জন সাহেবের আবিষ্কৃত এই অদৃশ্য আলোক-রশ্মির সম্মুখেও সেইরূপ তাঁহার হাতের হাড়গুলি এক প্রকার অভেদ্য হওয়ায় বেরিয়াম প্লাটিনো-সায়ানাইডের পাতটীর তদনুযায়ী কতকটা অংশে বেশ গভীর ছায়া পড়িল, সুতরাং পাতটীর সেই স্থান হইতে তীব্র জ্যোতিঃ বিকীরণ একরূপ বন্ধ হইল, কিন্তু কাঁচ যেমন সূর্য্যালোকের গতি প্রতিরোধ করিতে পারে না; হস্তের মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতিও সেইরূপ এই অদৃশ্য আলোক-রশ্মির গতি প্রতিরোধে প্রায় অসমর্থ হইল বলিয়া, বেরিয়ান্-প্লাটিনো-সায়ানাইডের পাতটীর তদনুযায়ী স্থানগুলি প্রায় পূর্ব্ববৎ তীব্র জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে লাগিল।

ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর আলোক পড়িলে

প্লেট্‌টী যে ঝলসাইয়া যায়, ইহা তোমরা সকলেই জ্ঞান বোধ হয়; নবাবিষ্কৃত এই অদৃশ্য আলোকে ফটোগ্রাফির প্লেট ঝলসায় কিনা দেখিবার জন্য রন্‌জেন সাহেব একখানি ফটোগ্রাফির প্লেট কাল কাগজে মুড়িয়া ইহার সম্মুখে ধরিলেন—দেখিলেন সত্যই ইহা ঝলসায়, তখন তিনি আর একখানি ফটোগ্রাফির প্লেট কাল কাগজে মুড়িয়া পুনরায় এই অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে ধরিলেন—কিন্তু একবার নিজের হাতখানি সেই গোলক এবং ফটো-গ্রাফির প্লেটের মধ্যে ধরিলেন। ফলে হাতের হাড়গুলির একটী "নেগেটিভ" ফটো সেই ফটো-গ্রাফির প্লেটেব উপর অঙ্কিত হইয়া গেল।

এই অদৃশ্য আলোকের এই অদ্ভুত ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া রন্‌জেন একদিকে যেমন অতি মাত্রায় বিস্মিত হইলেন,—অন্যদিকে তেমনি একটি তথ্যের আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রন্‌জেন এই অদৃশ্য আলোকের আবিষ্কার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহার স্বরূপ

নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না। তাই তিনি 'এই আলোকের নাম রাখিলেন "একস্ রে" বা অজ্ঞাত আলোক-রশ্মি।

এই অদৃশ্য আলোকের বিশেষত্ব হইল এই যে, যে জিনিসের গুরুত্ব যত অধিক, সেই জিনিস সেই পরিমাণে ইহার গতি রোধ করে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে বৈজ্ঞানিকের নিকট বরং ইহাই সূর্য্যালোকের অপেক্ষা অনেক বেশী সহজ ও স্বাভাবিক আলোক বলিয়া মনে হয়। প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে সূর্য্যালোক আমাদের চোখে সহিয়া গিয়াছে; তাই সূর্য্যালোকের বিস্ময়কর এবং সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বগুলি আমাদের সাধারণ চক্ষে বড় একটা ধরা পড়ে না— তাই আমরা একমাত্র সূর্য্যালোককেই স্বাভাবিক এবং সহজ আলোক মনে করি। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সূর্য্যালোক যে কত বড় একটা সৃষ্টি-ছাড়া বিস্ময়, ইহা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে সূর্য্যালোক এক খণ্ড মোটা বিষম ভারী কাঁচের

প্লেট্‌কে স্বচ্ছন্দে ভেদ করিয়া অবাধে চলিয়া যায়, তাহাই আবার একটুকরা পাতলা ফিন্‌ফিনে হাল্‌কা কাল রংয়ের কাগজকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। আর এই জন্যই সূর্য্যালোক মনুষ্যকে যে দৃষ্টি দান করিতে পারে নাই—একস্‌রে মানুষকে সেই দৃষ্টি দান করিয়াছে।

আজ "একস্‌-রে"র সন্ধান পাইয়া মানুষ যেন নূতন দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। জীবন্ত প্রাণী-দেহে অস্ত্রাঘাত না করিয়াও মানুষ ইহার সাহায্যে তাহার সকল অস্থির অবস্থিতি-স্থান জানিতে পারিতেছে। ফুটবল খেলিতে খেলিতে যখন কোনও খেলোয়াড় হাত পা ভাঙ্গে, তখন ইহার সাহায্যে কোন হাড়-খানি কিরূপভাবে ভাঙ্গিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায়—তাহার জন্য খেলোয়াড়ের দেহে অস্ত্রাঘাতের আবশ্যক হয় না। যুদ্ধে গুলি খাইয়া যখন কোন সৈনিক হাঁসপাতালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তখন ইহার সাহায্যে, সৈনিকের কোন্ স্থানে গুলি আট্‌কাইয়া আছে, তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক বাহির করা

হয়। "এক্স্-রে"র আবিষ্কারে যে এইরূপে পৃথিবীর কতদূর মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

উপকথার পরী তাহার হস্তস্থিত মন্ত্রপূত দণ্ডটী সঞ্চালন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া, বিদ্যুৎ যে সকল অসাধ্য সাধন করিতেছে, বোধ হয় তাহার কল্পনা উপকথার পরীর মস্তকেও আসে না।



(চ) দূরে সংবাদ প্রেরণ।

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে দূরদেশে সংবাদ-প্রেরণের আবশ্যকতা হইলে মানুষ যে উপায়-অবলম্বন করিত, ষাট বৎসর পূর্ব্বেও মানুষ সংবাদ প্রেরণের জন্য তাহাপেক্ষা কোনও উন্নততর উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। রাজা অশোকের সময় সংবাদ-প্রেরণের জন্য হিন্দুরা যে অশ্বারোহী দূতকে নিযুক্ত করিতেন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদিগকে সংবাদ-প্রেরণের জন্য সেই অশ্বারোহী দূতকেই নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বিজ্ঞান যে মানুষকে কতদূর শক্তিশালী করিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজ যদি পৃথিবীর অপর পারে আমেরিকায় কোনও ঘটনা ঘটে; তবে কালই কলিকাতা সহরে সে সংবাদ লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে।

বিজ্ঞানের দান।

টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং তারহীন টেলিগ্রাফ যে মানুষের পরস্পরের দূরত্বটুকু কেমন করিয়া লোপ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

১। টেলিফোন্।

সহরের এক প্রান্তে বসিয়া পাটের দালাল শ্যাম বাবু সহরের অপর প্রান্তস্থিত পাটের ব্যবসায়ী টমাস্‌কে টেলিফোনের নল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দরে তাঁহারা পাট কিনিতে পারেন; মুহূর্ত্তের মধ্যে উত্তর আসিয়া গেল। যেন একই ঘরের এক প্রান্ত হইতে একজন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল; এবং অপর প্রান্ত হইতে অন্যে তাহার উত্তর দিল। এতখানি পথ শ্যামবাবুকে এই সংবাদটুকু জানিবার জন্য হাঁটিয়া বা গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে হইল না, বা তাহার জন্য দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল না; বিনা পরিশ্রমে, মুহূর্ত্তের মধ্যে যাহা জানিবার ছিল, তাহা জানা হইল।

একজন কথা কহিল, অপর একজন টেলিফোনের সাহায্যে অত দূরে বসিয়া কিরূপে সেই স্বর স্পষ্ট শুনিতে পায়, ইহা ভাবিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য

স্থিত হইয়া যাইবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটী বুঝা বেশী শক্ত নয়।

পুকুরের নিস্তরঙ্গ শান্ত জলের উপর যদি টুপ করিয়া একটী ঢিল নিক্ষেপ করা যায়, তবে সেই ঢিলটীর চারি পাশ হইতে যে একটা তরঙ্গ উঠিয়া তাহা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে সমস্ত পুকুরটীময় ব্যাপ্ত হয়, তাহা তোমারা অনেকেই দেখিয়াছ। আমাদের চারি পাশে এই যে অবিচ্ছিন্ন বায়ু-সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা যখন কথা বলি, তখন সেই বায়ু-সমুদ্রে তেমনি তরঙ্গ উঠিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। সেই বায়ু-তরঙ্গ যখন কাহারও কর্ণপটহকে কম্পিত করিতে থাকে, তখনই সে ব্যক্তি ঐ শব্দ শ্রবণ করে। দূর হইতে কথা কহিলে কথা যে অস্পষ্ট শুনায়, তাহার কারণ, যে সমস্ত বায়ু-তরঙ্গ শ্রোতার কর্ণপটহে আঘাত করিয়া শ্রোতার নিকট কথার অনুভূতি জন্মায়, অনেক দূর যাইতে যাইতে সেই সমস্ত তরঙ্গের তীব্রতা কমিয়া যায়। কিন্তু এমন যদি কোনও যন্ত্র

আবিষ্কার করা যায়, যাহাতে বক্তার নিকট বায়ুতে যেরূপ তীব্রভাবে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, শ্রোতার নিকটও সেইরূপ তীব্রভাবে তরঙ্গগুলি পৌঁছে, তাহা হইলে বক্তার কথাগুলি শুনিতে শ্রোতা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা অনুভব করিবে না। টেলিফোন্ সেইরূপ একটী যন্ত্র।

অত্যন্ত পাতলা ফিন্‌ফিনে দুইখণ্ড পাত, এই যন্ত্রটীর একটী আবশ্যকীয় অঙ্গ। সেই পাত দুই খানির একখানি থাকে বক্তার মুখের কাছে;— আর একখানি থাকে শ্রোতার কানের কাছে। এই অত্যন্ত পাতলা পাত দুইখানি বিদ্যুৎবাহী তার দ্বারা এমনভাবে সংযোজিত যে প্রথম পাত-খানি ঠিক যেরূপভাবে কাঁপিতে থাকে, দ্বিতীয় পাতখানিও অবিকল সেইরূপভাবে কাঁপিতে থাকে। এখন প্রথম পাতখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেহ কোনও কথা বলিলে, বক্তার স্বরের উচ্চতা, নিম্নতা, গভীরতা প্রভৃতি প্রকারভেদ অনুসারে, প্রথম পাতলা পাতখানি জোরে, ধীরে অথবা দ্রুত-

তর আন্দোলিত হইতে থাকে,—এবং দ্বিতীয় পাতখানিও ঠিক অবিকল প্রথম পাতখানির ন্যায়, জোরে ধীরে অথবা দ্রুততর আন্দোলিত হয়। সুতরাং সেই সময় কেহ যদি দ্বিতীয় পাতটার সম্মুখে দাঁড়ায় তবে সে দেখিবে দ্বিতীয় পাতটা কাঁপিতেছে; এবং ঠিক সেই কথাগুলি শুনিবে—যেগুলি বক্তা প্রথম পাতটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল। এই মাত্র প্রভেদ যে, শ্রোতা দেখিবে বক্তার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পাতটা কথা বলিতেছে। ইহাই হইল মোটামুটি টেলিফোনের রহস্য।

আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা সকলেই খেলাঘরে এই টেলিফোনের খেলা খেলিয়া থাকে। তোমরাও হয়ত কতবার খেলিয়াছ। সামনের ছবিতে দেখিতেছ, একখণ্ড সূতার দুই কোণে দুইটি দিয়াশলায়ের বাক্স আঁটিয়া ছাদের দুই কোণে দুইটি ভাই বোন দাঁড়াইয়া আছে। সূতাটাকে খুব টান করিয়া ধরিয়া দিয়াশলায়ের বাক্সে মুখ

দিয়া ভাই-বোন নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অত দূরে থাকিয়াও ভাইবোনে পরস্পরের কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে! সামান্য খেলাঘরে এইরূপে ছেলেমেয়েরা যে খেলা খেলিয়া আসিতেছিল, আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে সামান্য সেই কথা চলাচলন ব্যাপারটা বিদ্যুতের সাহায্যে—উন্নতপ্রণালীর ছাঁচে পড়িয়া জগতের একটি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

২। টেলিগ্রাফ।

টেলিগ্রাফ জিনিসটী একটু ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের স্বরটাকে যন্ত্রের মধ্যে ধরিয়া একেবারে অবিকলভাবে শ্রোতার নিকট পাঠাইবার চেষ্টা ইহাতে নাই। সেই হিসাবে এই জিনিসটা অনেকটা সোজা। শব্দের বদলে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

পোষ্টআফিসে টেলিগ্রাফের "টরেটক্কা" "টরেটক্কা" শব্দ শুনিয়া তোমরা হয়ত কতদিন বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছ, ঘরের মধ্যে বসিয়া এইরূপ "টরেটক্কা" শব্দ করিয়া টেলিগ্রাফ-বাবুটী কেমন করিয়া কত দূরদুরান্তরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন! সেই কথাই তোমাদিগকে এখন বলিব।

টেলিগ্রাফের প্রধান কৌশল হইতেছে, টেলি-গ্রাফের তারের মধ্য দিয়া একবার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ





বে-তার বার্ত্তা পাইয়া জাহাজ বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আসিতেছে।

প্রেরণ করা, এবং তাহার পর মুহূর্ত্তেই বিদ্যুৎ প্রেরণ বন্ধ করা।

টেলিগ্রাম পাঠাইবার সময় টেলিগ্রাফবাবু যে চাবিটাকে একবার টিপিয়া এবং একবার ছাড়িয়া "টরেটক্কা" শব্দ করেন, সেই চাবিটা এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে টিপিয়া রাখা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে থাকে, কিন্তু উহাকে ছাড়িয়া দিলেই চাবির নীচের একটা স্প্রীং-এর জোরে চাবিটা একটু উপরে উঠিয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফের তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চলা বন্ধ হয়।

টেলিগ্রাম পৌঁছিবার স্থানে আবার আর একটী যন্ত্র এইরূপ ভাবে সাজান আছে যে টেলিগ্রাম পাঠাইবার স্থান হইতে যদি মাত্র এক নিমেষের জন্য বিদ্যুৎ প্রেরণ করা হয়, তবে সেই যন্ত্র-সন্নিবিষ্ট একটী কাগজের উপর একটী ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ (.) দাগ পড়িবে; কিন্তু যদি টেলিগ্রাম

পাঠাইবার স্থান হইতে একটু বেশী সময়ের জন্য বিদ্যুৎ প্রেরণ করা হয়, তবে সেই কাগজের উপর একটী দাঁড়ি (—)র ন্যায় দাগ পড়ে।

যখন কোনও টেলিগ্রাম পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, তখন পাঠাইবার স্থানের টেলিগ্রাফ বাবু তাঁহার টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের চাবিটাকে কোনওবার বা নিমেষ কাল মাত্র টিপিয়া ধরিয়া টেলিগ্রাফের তারটীর মধ্য দিয়া নিমেষের জন্য বিদ্যুৎ পাঠান; কোনওবার-বা একটু বেশী সময় টিপিয়া রাখিয়া একটু বেশী সময়ের জন্য বিদ্যুৎ পাঠান। টেলিগ্রাম পৌঁছিবার স্থানে অমনি সেই অনুসারে একখানি কাগজে বিন্দুবৎ অথবা দাঁড়িবৎ দাগ পড়ে। এই বিন্দু এবং দাঁড়িই হইল টেলিগ্রাফের সাঙ্কেতিক চিহ্ন;—এবং সেই বিন্দু এবং দাঁড়ির অবস্থিতি-স্থান লক্ষ্য করিয়া, টেলিগ্রাম পৌঁছিবার স্থানের টেলিগ্রাফ-বাবুটী বুঝিতে পারেন, তাঁহার নিকট কি সংবাদ আসিল।

বিন্দু এবং দাঁড়ি দ্বারা কি প্রকারে সংবাদ

বুঝা যাইতে পারে তাহা বোধ হয় তোমরা ভাবিয়া পাইতেছ না? ওই বিন্দু অথবা দাঁড়িকে নানা প্রকারে সাজাইয়া বর্ণমালার এক একটী অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন ধর, একটী বিন্দুতে (.) 'অ' বুঝিতে হইবে। একটা দাঁড়িতে (—) 'আ' বুঝিতে হইবে। একটী বিন্দু এবং একটী দাঁড়িতে (. —) 'ই' বুঝিতে হইবে। একটা দাঁড়ি এবং একটী বিন্দুতে (— .) 'ঈ' বুঝিতে হইবে। দুইটী দাঁড়ি এবং একটী বিন্দুতে (— — .) 'উ' বুঝিতে হইবে।

অবশ্য, আমাদের পোষ্টাফিস-সমূহে যে টেলিগ্রাফ হয় তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অক্ষরের পরিবর্ত্তে ঐ সকল সঙ্কেত ইংরাজি ভাষায় ব্যবহার করা হয়। কেন না, ইংরাজী ভাষায় মোটের উপর অক্ষর সংখ্যা কম; এবং ইংরাজি অক্ষর পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকেরই পরিচিত। এইবার বোধ হয় তোমরা বুঝিয়াছ যে টেলিগ্রাফ ব্যাপারটি কি?

৩। তারহীন টেলিগ্রাফ।

উপরে যে টেলিগ্রাফের কথা বলা হইল, তাহার ব্যবহারের জন্য তার লাগে—সে এক হাঙ্গাম। দশ হাজার মাইল সংবাদ পাঠাইতে হইলে, আগে এই দশ হাজার মাইল পথ তার পুঁতিতে হইবে, তবে সংবাদ পাঠান সম্ভব হইবে। এত কষ্ট এত অসুবিধা মানুষ সহ্য করিবে কেন? বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাই এখন বিনা তারেই টেলিগ্রাফ করিবার উপায় মানুষ বাহির করিয়াছে—হাজার হাজার মাইল দূরে খবরাখবর এখন প্রত্যহই বিনা তারে চলিতেছে।

আসলে, বিনা তারে টেলিগ্রাফ যে তারের মধ্য দিয়া টেলিগ্রাফের অপেক্ষা বেশী শক্ত, তাহা নহে। বরঞ্চ যখন বিনা তারে টেলি-গ্রাফ এবং তারের মধ্য দিয়া টেলিগ্রাফ এই

বিজ্ঞানের দান।

দুইটী বিষয়কে পাশাপাশি মিলাইয়া দেখা যায়, তখন বৈজ্ঞানিকের নিকট তারের মধ্য দিয়া টেলিগ্রাফটীকেই বেশী আশ্চর্য্যজনক মনে হয়।

হাওয়ায় তরঙ্গ উঠিলে যেমন শব্দের সৃষ্টি হয়, বৈজ্ঞানিক মনে করেন ঈথর নামক পদার্থে তরঙ্গ উঠিলে তেমনি বিদ্যুতের উদ্ভব হয়। এই ঈথর পদার্থটী যে কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ সঠিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে বৈজ্ঞানিক মনে করেন, এই ঈথর এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি কণিকাটুকুতে পর্য্যন্ত ইহা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের এ কল্পনা যদি সত্য হয়, তবে যে কোনও স্থানে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করিলে — চারি পার্শ্বের অনন্ত ঈথর-সমুদ্রে অমনি তরঙ্গ উঠিবে, এবং পুকুরের জলের ঢেউয়ের ন্যায় সে তরঙ্গ কেবলি দূর হইতে বহুদূরে ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। সুতরাং সে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ধরিবার কোনও যন্ত্র যদি কোনও খানে থাকে, তবে

বিজ্ঞানের দান।

তাহাতে সে তরঙ্গ ধরা পড়িবে। এবং এইরূপে একস্থান হইতে বিদ্যুতের ঢেউ তুলিয়া সঙ্কেত করিলে, অন্য স্থান হইতে যন্ত্রধারী ব্যক্তি সে সঙ্কেত বুঝিতে পারিবে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতি এত দ্রুত যে, কোনও একস্থান হইতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উদ্ভব হইলে, এক নিমিষের মধ্যে তাহা সারা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

সুতরাং পৃথিবীর একস্থান হইতে এইরূপ সঙ্কেত প্রেরণ করিলে পৃথিবীর অন্যস্থানে সে সঙ্কেত পৌঁছিতে মুহূর্ত্তমাত্র দেরী হয় না।

এই উপায়েই তারবিহীন টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হইয়াছে।

মানুষ এখন বিজ্ঞানের বলে কতদূর শক্তি-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা তোমরা ঐ ছবি দেখিয়াই বুঝিবে। দূরে একখানি জাহাজে আগুন লাগি-য়াছে। আগে এরূপ হইলে মৃত্যু বিনা আর কোনও উপায় থাকিত না। আজ কিন্তু বৈজ্ঞানিক এরূপ বিপদে বাঁচিবার অনেক উপায় করিয়াছেন।

জাহাজে এমন সব জ্যাকেট আছে, যাহা পরিলে সন্তরণে অনভ্যস্ত লোকও জলে ভাসিতে থাকে। ঐ দেখ লোকগুলি সেই সব জ্যাকেট পরিয়া জলে ভাসিতেছে, আর স্ত্রীলোক ও শিশুরা জীবন-তরীতে (Lifeboat) চড়িয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। এইরূপ সময়ে তাহাদের কে সাহায্য করিবে? এই কয়েক বৎসর আগেও এই রকম জলে পড়িয়া লোকেরা হাহাকার করিতে করিতে ডুবিয়া মরিয়াছে।

আজ আর তাহাদিগকে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না। বিজ্ঞান এখন বিনা-তারে টেলিগ্রাফ করার উপায় বাহির করিয়াছে। তাহারই সাহায্যে অকূল সমুদ্রের মাঝখান হইতেও বিপন্ন জাহাজ হইতে ইতস্ততঃ বিপদের বার্ত্তা প্রেরণ করা সম্ভব হইয়াছে;-- আর ঐ দেখ, সে বিপদ-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া দূরে আর একখানি জাহাজ বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আসিতেছে।

বিজ্ঞানের দান।

এই তারহীন টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কণি জগতের সম্মুখে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে আমাদের বাঙ্গাল দেশের বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু মার্কণিরও আগে বিনাতারে টেলিগ্রাফের যন্ত্র উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(ছ) দূরত্বের হ্রাস।

এই সেদিনও বৃদ্ধেরা তীর্থস্থানে কিম্বা দূরদেশে যাইবার সময় নিমন্ত্রণ করিয়া লোক-জনকে আহার করাইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন—হয়ত বা, এই যাত্রা শেষ যাত্রা হইয়া দাঁড়ায়, তাই জন্মের মত সকলের সহিত একবার দেখা করিয়া লইলেন। আর আজ সেই বৃদ্ধ অর্দ্ধোদয় আসিলেই গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, শরীর অসুস্থ বোধ হইলেই বায়ু-পরিবর্ত্তনে চলিয়াছেন।

এই যে নিতান্তই সেদিনকার কথা, অনেক বৃদ্ধেরই মনে আছে যেদিন প্রথম রেলগাড়ী চলে, ষ্টীমার কোম্পানী একরাশি ধূম উড়াইয়া, হুইসিল (whistle) দিয়া ষ্টীমারে যাত্রী লইতে আরম্ভ করে। প্রথম তখন অনেকে এ সবকে ভূতের কাণ্ড

বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইল বাস্তব জগতে ভূতের উপদ্রব বড় একটা হয় না, এটা ইষ্টীম ভূত নয়, সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তিকেই কাজে লাগাইয়া বিজ্ঞান এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে।

এটা ত হইল দূরদেশে যাইবার জন্য ; কিন্তু এই ৫।৬ মাইল দূরে যে বন্ধুদের বাড়ী আছে, সেখানে যাইতে যে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়—তাহার উপায় কি ? অবশ্য সকলেই এ সম্বন্ধে মাথা খাটাইতে লাগিল, কিন্তু দরকার সব চেয়ে বেশী বোধ করিল—ডাকাতেরা। এইরূপ একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী ডাকাতের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে যে সহজ দ্রুতগামী যানের উদ্ভাবন হইল—তাহারই সুসভ্য সংস্করণ তোমাদের এই বাইসিকেল।

আমাদের দেশের ডাকাতেরা আবার শুধু দুইখানি বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়া বোঁ বোঁ করিয়া রেলগাড়ীর মত অনায়াসে ছুটিয়া যাইতে পারিত। অবশ্য এতে অভ্যাসেরও যেমন দরকার,

হাত-পায়ের কব্জিতে একটু জোর রাখাও তেমনি দরকার হইত। এবং সেই সঙ্গে দরকার হইত তাল রাখিয়া চলাটা খুব অভ্যাস করা।

বাইসিকেল ইত্যাদি মানুষের যাতায়াতের তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে অভাব দূর করিল মটরকার। মাটীর নীচে এক রকম খনিজ তৈল (পেট্রোল) জন্মায়। সেই পেট্রোল হইতে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই মটরকার চালিত হয়। ক্রমে জল-পথেও মানুষ পেট্রোল দিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল।

ইলেকট্রিকের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক নূতন যুগের আভাস পাইয়াছে। জল, Steam হইবে, কিন্তু ইলেকট্রিকে কাজ করিতে হইলে কিছুরই দরকার হয় না, শুধু বোতাম টিপিলেই হয়। ইলেকট্রিকে কার্য্য-চালানর প্রচলন অতি অল্প দিনই হইয়াছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে এত অল্প খরচে ইলেকট্রিক-শক্তি উৎপন্ন

হইয়েছে, যে আশা করা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্য ইলেকট্রিকে চলিবে।

যাতায়াতের কষ্ট লাঘব করিতে ইলেকট্রিক যে এত কাজে লাগিবে, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে বুঝেন নাই। আজ যে আমরা এত ইলেকট্রিক ট্রেণ, ইলেকট্রিক ট্রাম প্রভৃতি দেখিতে পাইতেছি, সে সবই ইলেকট্রিকে চালিত।

ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রায়ই বাড়ীগুলি ৫।৬ তলা হইয়া থাকে, এবং ব্যবসায়ী লোকেদের ৩০।৪০ বার করিয়া একতলা দুইতলা করিতে হয়। অবশ্য আগেকার কালে, এত উঠা নামা করা একরূপ অসম্ভব হইত; কিন্তু আজকাল ইলেকট্রিক লিফ্‌-টের (Electric Lift) সাহায্যে ৩০।৪০ বার কেন ১০০ বার উঠা-নামা করিতেও কোন কষ্ট বোধ হয় না—ইলেকট্রিক লিফ্‌টে উঠিলে ফুস্ করিয়া এক মিনিটে দো-তলায় উঠাইয়া দেয়।

এতদিন যাতায়াত করা বলিতে আমরা

বিজ্ঞানের দান।

স্থল-পথে যাতায়াতই বুঝিয়াছি; কিন্তু সেই রামায়ণে পড়া পুষ্পক রথ আজ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেল ষ্টীমার, মটর কেহই এই বিমান বিহারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া পারিতেছে না। ইংরাজ-দের দেশ এতদিন দুর্ভেদ্য ছিল। স্বয়ং নেপোলিয়নও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, একঘণ্টা কালের জন্য সে দেশে—কোনও রকমে আনিতে পারেন নাই; কিন্তু সেদিন বিজ্ঞানের বলে জার্ম্মানরা রাত্রিকালে চোরের মত আসিয়া অনাথ বালক-বালিকাদিগকে হত্যা করিয়াছে। 'শূন্যে যে একটা বিশাল রাজত্ব অনধিকৃত পড়িয়া ছিল, এবং সেই রাজ্যের মধ্য দিয়াই যে ভবিষ্যতে আমাদের যাতায়াতের পথ হইবে, তাহার অনেক আভাস আমরা পাইতেছি।

(জ) অস্ত্রবিদ্যা চিকিৎসা।

আধুনিক যুগে অস্ত্র-বিদ্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এত আর কোনও দিকে নয়। এই অস্ত্র-বিদ্যাকে যিনি এত দ্রুত উন্নতির পথে উঠিবার উপায় করিয়া দেন, তাঁহার নাম লর্ড লিস্টার।

পূর্ব্বে কোনও একটা স্থানে ক্ষত হইলে, সে ক্ষত শীঘ্র সারাইবার কোনও উপায় মানুষ জানিত না—অনেক সময়েই দেখা যাইত ক্ষত না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। লর্ড লিস্টার প্রথম বিজ্ঞান জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়া বুঝাইয়া দেন, আমাদের চারিপার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুতে ভরা। মানবদেহে যখনই কোনও ক্ষত হয়, তখনই বায়ুমণ্ডলস্থ অসংখ্য কীটাণু সেই ক্ষত স্থানে প্রবেশ

লাভ করিয়া, সেই ক্ষতটীকে ক্রমাগতই বাড়াইয়া তুলিতে থাকে,—এবং তাহার সারিবার পথ বন্ধ করিয়া দেয়। লিস্টার বলিলেন যে, যদি এমন কোনও ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করা হয়, যাহার তীব্র ঝাঝ্ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষতস্থানের কীটাণুগুলি মরিয়া যাইবে, এবং তাহার পর যদি ক্ষতস্থানটিকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ক্ষত আর বাড়িতে পারিবে না; পরন্তু শরীরের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মে যে সমস্ত ক্ষতস্থান মেরামত-কারী জীবাণু আছে, তাহাদের চেস্টায় ক্ষতস্থান শীঘ্র সারিয়া উঠিবে। লিস্টারের মতানুসারে এইরূপে যে চিকিৎসার প্রবর্ত্তন হইল, তাহার নাম আণ্টিসেপ্টিক্ চিকিৎসা। টিনচার আইডিন্ (Tincture of Iodine), আইডোফর্ম্ম (Iodoform) প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা এই প্রকারে কীটাণুর ধ্বংস করা হইত।

ইহার কিছুদিন পরেই মানুষ দেখিল যে

বিজ্ঞানের দান।

লর্ড লিষ্টারের প্রবর্ত্তিত চিকিৎসায় ক্ষত সারে বটে, কিন্তু এই উপায়ে ক্ষত সারিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। যে তীব্র ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষত-বৃদ্ধিকারী জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করা হয়, সেই ঔষধেরই তীব্র তেজে শরীর মধ্যস্থ ক্ষতস্থান মেরামত-কারী জীবাণুগুলিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং আণ্টিসেপটিক চিকিৎসায় ক্ষত আর বাড়ে না বটে, কিন্তু ক্ষত তেমন শীঘ্র সারেও না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তখন মানুষ যে নূতন ক্ষত-চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল, তাহা এই।

ক্ষতস্থানটীকে অতি সাবধানে গরম জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়—যাহাতে আর ক্ষত-স্থানে অনিষ্টকারী জীবাণু না থাকে; তাহার পর সাবধানে উহা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। তখন শরীর মধ্যস্থ ক্ষত-মেরামতকারী জীবাণুগুলি অতি সত্বর ক্ষতকে আরাম করে। এই নূতন পদ্ধতির নাম হইল আ-সেপ্‌টিক্‌। অসুবিধা হইল এই যে, এই উপায়ে ক্ষত-স্থান হইতে

সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টকারী জীবাণু ধৌত করিয়া ফেলা অধিকাংশ সময়েই সম্ভব নয়, কারণ যেখানে এক আঙ্গুল স্থানের বায়ুতে লক্ষ লক্ষ জীবাণু বিচরণ করিতেছে, সেখানে একবার ক্ষত ধুইয়া ফেলিলেও পুনরায় তখনি অসংখ্য জীবাণু ক্ষত-স্থানে প্রবেশ করিবে। সুতরাং এই প্রকার চিকিৎসা চালাইতে হইলে এমন একটা ঘরে লইয়া গিয়া রোগীর ক্ষতস্থান ধুইতে হইবে, যে স্থানে আর একটীও বীজাণু জীবিত নাই; অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই যে ঘর গরম বাষ্পে পূর্ণ করিয়া, তাহার মধ্যের সমুদয় জীবাণু মারিয়া ফেলা হইয়াছে। এমন কি যে চিকিৎসক সেই রোগীর ক্ষত-স্থান ধুইয়া দিবেন, তাঁহার জামা, কাপড়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুতেই জীবিত জীবাণু লাগিয়া থাকিবে না, এইরূপ হওয়াই উচিত।

এইরূপ উপায়ে চিকিৎসা করা যে কতদূর অসুবিধাজনক, তাহা এই গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময় মানুষ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল প্রতিদিন

যুদ্ধক্ষেত্রে কত বড় বড় সেনাপতি আহত হইতেছেন; যুদ্ধ ভালরূপ চালাইবার জন্য অতি শীঘ্র সেই সকল সেনাপতির সারিয়া উঠা আবশ্যক। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আ-সেপটিক্ শুশ্রূষার উপযুক্ত অত জীবাণু-শূন্য ঘরই বা কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহাদের চিকিৎসার অত পরিপাটী বন্দোবস্তই বা কিরূপে হইবে?

অমনি জগতের যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক সবাই উপায় উদ্ভাবনে লাগিয়া গেলেন,—কিরূপে এমন একটি ঔষধ বাহির করা যায়, যাহা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে অনিষ্টকারী জীবাণুগুলি তখনই মরিয়া যাইবে, অথচ শরীর-মধ্যস্থ ক্ষত মেরামতকারী জীবাণুগণের কিছুই ক্ষতি হইবে না। জগতের সমবেত বৈজ্ঞানিকের কয় বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, অবশেষে বৈজ্ঞানিকের সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান মিলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইহার নাম রাখিয়াছেন "ফ্যাভিন্ (flavine)। ইয়োরোপীয় যুদ্ধে জগতের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে

বটে, কিন্তু এক হিসাবে ইহা জগতের অশেষ উপকার সাধনও করিয়াছে। এই যুদ্ধই "ফ্যাভিন্" এর ন্যায় একটী অমূল্য পদার্থের সন্ধান দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আশা করিতেছেন, অস্ত্র-চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া "ফ্যাভিন্" অসাধ্য সাধন করিবে।

(ঝ) উদ্ভিদের প্রাণ।

ভারতে আজ পর্য্যন্ত যত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিদেশীয়েরা তাহার মূল্য যতই কেন কম করিয়া ধরুন না, বিজ্ঞান-জগতে ভারতের স্থান অপর জাতিরা যতই কেন নিম্নে নির্দ্দেশ করুন না, অন্ততঃ ভারতের প্রত্যেক বালক-বালিকার জানিয়া রাখা উচিত যে, বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে ভারত বড় কম দান করে নাই।

প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে কি করিয়াছে, না করিয়াছে, সে সমস্ত যদি ছাড়িয়াই দিই, তাহা হইলেও বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্র বিজ্ঞান-জগৎকে যাহা দিয়াছেন, তাহার মূল্যও কম নহে! বাকী যাহা আছে, তাহা তোমরা, আশা করি, বড় হইয়া দিবে।

বিজ্ঞানের দান।

উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, এ কথা মানুষ আগে জানিত না। যে জিনিষ নড়িতে পারে না—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাহার যে আবার প্রাণ থাকিতে পারে এ বিশ্বাসই মানুষের ছিল না। অথচ নড়াচড়ার সঙ্গে প্রাণের যে খুব বেশী সম্পর্ক, তাহাও নহে। আবহমান কাল হইতে নদীর জল নাচিয়া নাচিয়া সমুদ্রের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে, অথচ জলকে জীবিত বলিয়া কেহই ভ্রম করে না। আকাশে মেঘ বিচরণ করে—কিন্তু তাহাতে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার কেহ করেন না। হুস্ হুস্ করিয়া এই যে রেলগাড়ী চলিয়া থাকে—ভোঁস্ ভোঁস্ করিয়া এই যে মোটর দৌড়ায়, তাহাদিগকে ত কেহ জীবিত বলেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে চলিতে পারে এমন অনেক জিনিষেরও প্রাণ নাই। তবে, শুধু চলিতে পারে না এই অপরাধে উদ্ভিদ বেচারা-কেই বা কেন জীবিত বলিয়া স্বীকার করা হইবে না?

বিজ্ঞানের দান।

বিজ্ঞানার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু প্রথম জগতের সম্মুখে প্রমাণিত করেন যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রদ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে দেখাইয়াছেন, উদ্ভিদের স্নায়ুগুলিও উত্তেজিত হইলে সাড়া দেয়;—তাহাদেরও যে সুখদুঃখের একটা সংসার আছে, এবং তাহাও যে ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে, আবার সময়ে কালের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, এ বার্ত্তা শুনিয়া এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্মিত পাশ্চাত্য জগৎ আজ ধন্য ধন্য করিতেছেন।

ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে, যিনি এত বড় একটা নূতন জগতের বার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছেন তিনি একজন ভারতবাসী;—আর তোমার আমার পক্ষে আশার কথা যে তিনি তোমার আমার মতই একজন বাঙ্গালী।

শেষ কথা।

বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য।

মানুষ যতই কেন বড় বড় কলকারখানা নির্ম্মাণ করিয়া, অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হউক না, পরমেশ্বরের সৃষ্ট সামান্য বস্তুটীর পর্য্যন্ত অদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া তাহাকে বিস্ময়ে মাথা নত করিতে হয়। কি নির্ম্মাণ-কৌশলে, কি সৌন্দর্য্যে, কি সজীবতায়, প্রকৃতিতে যাহা আছে হাজার চেষ্টা করিয়াও মানুষ তাহার সমকক্ষ কিছুই নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। প্রজাপতির একটা ডানায় যে সৌন্দর্য্য আছে, সমুদ্রতীরের একটা ঝিনুকে যে রংয়ের খেলা আছে,—তাহা মানব তুলিকার শত বর্ণ সম্পাতেও ফুটিয়া উঠে না, গোলাপ ফুলের পাঁপড়িতে যে কোমলতা, যে সজীবতা দেখা যায়, শত চেষ্টাতেও মানব সে কোমলতা, সে সজীবতা সৃষ্টি করিতে পারে না;—সামান্য একটী পশু, পক্ষী বা কীট পতঙ্গের দেহে যে অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-

কৌশল দৃষ্ট হয়, সেরূপ নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শন তো দূরের কথা,—তাহা বুদ্ধিগম্য করিতেই মানুষের প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

ভগবানের এই অদ্ভুত সৃষ্টির রহস্য যে কোনও দিন মানব তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইবে বা ইচ্ছামত নূতন সৃষ্টি রচনা করিতে পারিবে— এ দুরাশা মানুষ রাখে না; কিন্তু তাই বলিয়া যতদিন মানুষের দেহে জীবনীশক্তি থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের আগ্রহ, উদ্যম এবং স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টিরহস্যের সমস্ত কৌশলগুলি এক এক করিয়া বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টারও ত্রুটি করিবে না। যে দিন মানুষ এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় বিরত হইবে সে দিন সমস্ত জগৎ সংসার অচল হইবে,—সভ্যতার ক্রমোন্নতি সমস্তই এক নিমিষে স্তব্ধ হইয়া যাইবে;—সেদিন বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হইবে।

সমাপ্ত।